রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে

জ্যোতি বসু জন্মশতবর্ষ সংকলন প্রকাশ

উদ্বোধক ডঃ প্রভাত পট্টনায়ককে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক

জন্ম শতবর্ষ সংকলনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন ডঃ প্রভাত পট্টনায়ক

আগামী ৩ জানুয়ারি ২০১৫ হলে বিগত ৩ জানুয়ারি ২০১৫ প্রকাশিত হল "জ্যোতি বসু জন্ম শতবর্ষ সংকলন", প্রয়াত জননেতা ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বরাবরই রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনের বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পথ প্রদর্শক ছিলেন সেই মহৎ প্রাণ কমরেড জ্যোতি বসুর জন্ম শতবর্ষে এ সংকলন তাঁর প্রতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য। সংকলনটি প্রকাশ করলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ প্রভাত পট্টনায়েক।

পত্রিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র, পত্রিকা প্রকাশনার পর প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি বলেন কমরেড জ্যোতি বসু ছিলেন সংগ্রাম আন্দোলনের পথিকৃত। তাঁর জীবন নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সমারোহে বিভিন্নতায় পরিপূর্ণ, এক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবন, পরিষদীয় জীবন ও রাজনৈতিক জীবন বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ আন্দোলনে তিনি নিদর্শন রেখে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক গরিব সাধারণ মানুষের জমির অধিকারকে তিনি আইনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। ঐ মহান নেতার জীবন দর্শনকে নিজের জীবনে প্রতিনিয়ত চর্চা ও তাকে গভীরভাবে অনুশীলন করতে পারলে সেটাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এরপর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ প্রভাত পট্টনায়েক। (ডঃ প্রভাত পট্টনায়কের সম্পূর্ণ বক্তব্য ৫ম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল) □

ঐক্যবদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণী আন্দোলনই

পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলনের দিশা

পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন থেকে নির্বাচিত পদাধিকারীগণ

বিগত ২০-২৩ ডিসেম্বর ২০১৪-তে চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের লিখিত প্রতিবেদন ইংরেজিতে পেশ করেন অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার এবং হিন্দীতে পেশ করেন অপর সহ-সাধারণ সম্পাদক সুভাষ লাম্বা। আর্থিকনীতির প্রভাবে সারা বিশ্ব জুড়ে নেমে আসা আক্রমণের বিষয়ে তাঁরা আলোকপাত করেন। আমাদের দেশেও এই আক্রমণ ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে। ফলে কর্পোরেটদের মুনাফা লাভের জন্য দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর নেমে আসছে আর্থিক বঞ্চনা সহ সামাজিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবলা মুখার্জী প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করেন। পরবর্তীতে প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২৩ ডিসেম্বর সংগঠনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন সমগ্র আলোচনাকে সূত্রবদ্ধ করে জবাবী ভাষণ দেন। তিনি নব উদার আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের কর্মচারীদের তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর স্ব স্ব রাজ্যে উক্ত অর্থিক নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেন। জবাবী ভাষণ শেষ হলে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও খসড়া প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। □

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার (কেরালা)

প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় বিজয় শঙ্কর সিনহা

প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

প্রস্তাব সমর্থন করছেন দেবলা মুখার্জী

প্রস্তাব উত্থাপন করছেন অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অসীম পাল (ত্রিপুরা)

বিশ্ব বঙ্গবাণিজ্য সম্মেলন—পর্বতের মূষিক প্রসব

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অন্যান্য বছরের মতো এবারও আয়োজিত হয়েছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বহু সাধের 'শিল্প সম্মেলন'। ধার-দেনায় ডুবে যাওয়া রাজ্য কোষাগারের বহু অর্থ গুণাগারে জাঁক-জমকপূর্ণ আয়োজনের ত্রুটি ছিল না যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত 'বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন'-এর'। রাজ্যের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তো বটেই, ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীসহ দুই মন্ত্রী, সাংসদ তথা চলচ্চিত্রশিল্পী, বাংলাদেশ, নেপালসহ প্রায় ষোলটি দেশের কয়েকজন শিল্পপতি এবং আদি গোদরেজ, আইটিসি-র চেয়ারম্যান ওয়াই দেবেশ্বর, টিসিএস-র এন রামচন্দ্রনের মতো দেশের কয়েকজন শিল্পপতি হাজির থাকলেও রাজ্যে তেমন কোনো বিনিয়োগের প্রস্তাব আসেনি। 'নতুন বিনিয়োগ' বলে যা ঘোষিত হয়েছে তা হয় বাম আমলের প্রকল্প বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। যা ঘোষণার পর উপস্থিত প্রতিনিধিরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সাফল্যে কিন্তু উচ্ছ্বসিত। নিজের গরবে নিজেই গরবিনী হয়ে বলেছেন, "ফ্যাবুলাস, ফাটাফাটি...।"

গত সাড়ে তিন বছরে কোটি কোটি টাকা অর্থব্যয়ে কলকাতা ও হলদিয়া মিলে তিনবার শিল্প সম্মেলন এবং বিনিয়োগ টানতে মুম্বাই ও সিঙ্গাপুরে রোড শো করলেও পশ্চিমবঙ্গের কপালে বিনিয়োগের শিঁকে ছেঁড়েনি। উল্টে সরকারী অপদার্থতা ও মুখ্যমন্ত্রীর দলের হামলাবাজি ও

সিন্ডিকেটরাজের দৌরাত্ম্যে অনেক শিল্পসংস্থা বন্ধ বা এরাজ্য থেকে পাততাড়ি গোটাবার ব্যবস্থা করেছে। ফলে বেকারত্বের দৌড়ে এখন এরাজ্য অনেক ধাপ এগিয়ে। গুজরাত, কর্ণাটকে যেখানে বেকারের সংখ্যা প্রতি ১০০০ জনে ১২ এবং ১৮, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে ৫২। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত চাকুরীপ্রার্থী ৭০ লক্ষ ৮৬ হাজার (তথ্যসূত্র কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের সমীক্ষা, আঃবাঃ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

এবারের শিল্প সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি মোট ২ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। অথচ বাস্তব চিত্র বলছে অন্য কথা। প্রস্তাবের ৪২ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্প। যার পরিমাণ ১ লক্ষ ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকার। তার মধ্যে এন টি পি সি-র ২০ হাজার কোটি, সাগরে সমুদ্র বন্দর, সড়ক বাবদ ৪১,৬০০ কোটি, সেইল সম্প্রসারণ বাবদ ৪০ হাজার কোটি। আর এর জন্য কোনো শিল্প সম্মেলনেরই প্রয়োজন নেই। বেসরকারী প্রস্তাবের ৬৬ শতাংশ রিয়েল এস্টেট। ১২টি রিয়েল এস্টেট সংস্থা তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য ১৭৩৫ একর জমি চেয়েছে—যা সিঙ্গুরের গাড়ি কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জমির প্রায় দ্বিগুণ।

এ রাজ্যে বেকারীর প্রাচুর্যে মুখ্যমন্ত্রীর সানন্দ ঘোষণা শিল্পপতিদের সস্তায় শ্রমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। গর্বিত অর্থমন্ত্রীর অমৃত ভাষণ এ রাজ্যে ২০১৩-১৪-তে ধর্মঘটের কারণে একটিও শ্রমদিবস নষ্ট হয়নি। আর যেটা স্বাভাবিক কারণেই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় নি তা হল ২০১৩-১৪-তে রাজ্যে লকআউট হয়েছে ২৯৭টি। ২০১২-১৩-তে ২৯৪টি। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা মোট প্রায় ১ লক্ষ ৮১ হাজার। চটশিল্প-চাবাগান ধুকছে। ম্যানুফাকচারিং শিল্পে এরাজ্য একেবারে নিচের দিকে। তাছাড়া নতুন লগ্নির প্রস্তাব কিছু আসলেও তা রূপায়ণ আদৌ হওয়ার সম্ভাবনা এ রাজ্যে কটা সে বিষয়ে সকলেই সন্দিহান। ইনফোসিস প্রকল্প, জিন্দাল প্রকল্প তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যানও বলছে প্রকল্প রূপায়ণে এরাজ্য ক্রমেই পিছোচ্ছে। ২০১২ সালে এ রাজ্যে মাত্র ৩১২ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়ণ হয়েছিল—যা ২০১১ সালের তুলনায় ৮৫ শতাংশ কম। আর বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শেষ বছরের তুলনায় ৯৭ শতাংশ কম।

অতএব, শিল্প সম্মেলনের নামে জাঁক-জমক যাই হোক এবং তাকে কেন্দ্র করে সরকারী বাগাড়ম্বর যতই বাড়ুক এই নৈরাজ্যের রাজ্যে শিল্পায়ন এবং তার মধ্য দিয়ে বেকারদের চাকরীর সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কার্যত সুদূর পরাহত। □

বিজ্ঞপ্তি

প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসুর জন্ম শতবর্ষ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। জেলা/অঞ্চল ও সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সংকলন সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় দপ্তর, কর্মচারীভবন, ১০-এ শাঁখারিটোলা স্ট্রিট, কলকাতায়-১৪-তে দ্রুত যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রতি কপির গ্রাহকমূল্য ৮০ টাকা। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কেউ সংগ্রহ করতে চাইলেও উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলনের নীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব, সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের পক্ষে বিজয় শঙ্কর সিনহা ও বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীর বক্তব্য সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রামী হাতিয়ার ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। *—পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী*

সংগ্রামী হাতিয়ার

জানুয়ারি ২০১৫

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

৪৩তম বর্ষ □ নবম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভারত সফর

২৬ জানুয়ারি দিনটি আমাদের দেশে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে প্রতিপালিত হয়। যদিও ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালনের যে উদ্যোগ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস প্রতিপালনের উদ্যোগ তুলনামূলকভাবে কিছুটা কমই থাকে বলা যায়। দিল্লী বা কলকাতায় সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখতে ভীড় হয়তো কম হয় না, কিন্তু স্বাধীনতা দিবস প্রতি বছর এখনও যতটুকু আবেগ বহন করে আনে, প্রজাতন্ত্র দিবসে তা অনুপস্থিতি থাকে। যদিও গুরুত্বের নিরিখে এমনটা হওয়ার কথা নয়। কারণ ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের পর, একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের রূপরেখা কেমন হবে, কোন্ পথে এগোনো হবে, কেমনভাবে গড়ে তোলা হবে নিজেদের তার সমস্ত দিক্ নির্দেশ সঙ্কলিত হয়েছিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকরী হয় এই সংবিধান। স্বভাবতই দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আত্মবলিদান করেছিলেন, তাঁরা যে স্বাধীন-স্বয়ম্ভর দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁদের সেই স্বপ্নকে সার্থক করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়েছিল ২৬ জানুয়ারি। ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যদি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়, তাহলে ইমারত গড়ার কাজটা শুরু হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকেই। তবে একথা অনস্বীকার্য, সংবিধান প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে সমাজের সব অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের শাসকশ্রেণী এযাবৎকাল কখনোই আন্তরিক ছিলেন না। সংবিধান গৃহীত হবার পঁয়ষট্টি বছর পরেও একথা বলা যাবে না, বীর শহীদদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। কিন্তু অনেক কিছু নেই-এর মধ্যেও যেটুকু ইতিবাচক ছিল, তা হল বিশ্বের অঙ্গনে মাথা সোজা করে দাঁড়াবার একটা প্রচেষ্টা ছিল। বৃহৎ শক্তিধর কোনো দেশ অন্যায় করলে, দৃঢ়ভাবে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ছিল। পরিতাপের বিষয় হল রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে প্রায় দু-দশক আগে থেকেই। সাম্প্রতিক সময়ে যা শাসকশ্রেণীর বিশেষ কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'মন্ত্রী মিশন' বা 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর পরিকল্পনায় ভারতের নিজস্ব শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। ঐ বছরেরই জুলাই মাসে গণপরিষদ গঠনের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচন থেকে মোট ৩৮৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বি.আর আম্বেদকর, ডঃ রাধাকৃষ্ণান, আব্দুল গফ্ফর খান।

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, দুঃখ-দারিদ্রের অবসান ঘটানো, বৈষম্য ও শোষণের বিলোপসাধন এবং সুন্দর জীবনযাত্রার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই হবে গণপরিষদের লক্ষ্য। জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, গণপরিষদের প্রধান কাজ হবে প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী আত্মবিকাশের সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করা। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মত ছিল, গণপরিষদের মূল লক্ষ্য সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর নতুন দিল্লীর 'কনস্টিটিউশন হল'-এ গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর ২৯ আগস্ট ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি 'সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটি সংবিধানের যে খসড়া রচনা করে, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ তা চূড়ান্ত করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি এই সংবিধান প্রবর্তিত হয়।

গণপরিষদের বিশিষ্ট সদস্যদের উপরোক্ত অভিমতগুলি প্রতিফলিত হয় সংবিধানের প্রস্তাবনায়। যেখানে বলা হল—"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সাথে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল ভবিষ্যৎ শাসকশ্রেণীর প্রতি নির্দেশিকা। কিন্তু শাসকশ্রেণী এযাবৎকাল তাদের শ্রেণীস্বার্থেই সংবিধানের প্রস্তাবনার মর্মার্থকে কখনই অনুসরণ করেনি। ফলে 'সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার' বা 'সুযোগের সমতা' ছাপা অক্ষরেই থেকে গেছে। বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। তবুও যতটুকু লক্ষ্য করা গেছিল, তা হল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কিছুটা স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা। বলা যায় এই দুটি উপাদানের মধ্যেই স্বাধীনতার স্বপ্ন কিছুটা হলেও বেঁচে ছিল।

নব্বই-এর দশকে নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কারের প্রক্রিয়া চালু হবার পর এই দুটি উপাদানও দুর্বল হতে শুরু করে। গান্ধীজি, জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ছিলেন, সেই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারই এই কাজ শুরু করে। পরবর্তী দু'দশকে ক্ষমতার একাধিকবার হাত বদল হয়েছে, কিন্তু সংবিধানের লক্ষ্যকে লঙ্ঘন করার পরিকল্পনা থেকে শাসকশ্রেণী সরে আসেনি। উপরন্তু একদা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা সার্বভৌম ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী বিদেশ নীতির শরিকে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পেতে চলেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে। যার প্রতিফলন দেখা গেল প্রজাতন্ত্র দিবসে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে নতজানু হয়ে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে 'যোজনা কমিশন' বাতিলের ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রী রেখেছিলেন তারই পূর্ণরূপ প্রজাতন্ত্র দিবসে 'ওবামা বরণ'। মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভারত সফর যে নিছক সৌজন্য সফর নয়, তা উভয় দেশের শাসকবর্গের কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। মার্কিন অর্থনীতিকে ২০০৮-এ শুরু হওয়া দীর্ঘস্থায়ী মহাসঙ্কটের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য ভারতের বিপুল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ এবং বিশাল বাজার বারাক ওবামার প্রয়োজন। পাশাপাশি চীনের অগ্রগতিকে রোধ করার জন্য এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 'ন্যাটো'-র ধাঁচে একটি শক্তি জোট গড়ে তোলার জন্যও ভারতকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রয়োজন। তাই 'ভারত-মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক চুক্তি'-র পুনর্নবীকরণ, পরমাণু দায়বদ্ধতা বিলে যতটুকু রক্ষাকবচ রয়েছে তা বাতিল করা, বীমা ও প্রতিরক্ষায় অর্ডিন্যান্স জারি করে দেশী-বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া, দেশীয় পেটেন্ট আইনের পরিবর্তন করা প্রভৃতির উদ্যোগ জোর কদমে শুরু হয়েছে। গুজরাট গণহত্যার দায়ে যে নরেন্দ্র মোদীকে এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ভিসা' দিতে অস্বীকার করেছিল, আজ সেই নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় বারাক ওবামা গদগদ। আসলে বারাক ওবামা জানেন ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জুনিয়র পার্টনারে (সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে) পরিণত করার কাজে নরেন্দ্র মোদী একজন দক্ষ কারিগর। নরেন্দ্র মোদীও প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর এই দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানকে পরিবর্তন করেছেন 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-য়। 'মেড ইন ইন্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতে তৈরি। যার মধ্য দিয়ে কৃষি, শিল্প ও পরিষেবায় অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতের সম্পদকে ব্যবহার করে আর ভারতীয়দের শ্রমকে শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়ো। 'মেড ইন ইন্ডিয়া' যদি হয় আত্মপ্রত্যয়ের ঘোষণা, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' তাহলে দাসত্বের মনোভাবের পরিচায়ক।

তাই প্রজাতন্ত্র দিবসে বারাক ওবামার উদ্দেশ্যপূর্ণ সফর সংবিধানের মর্মবস্তুকে পদদলিত করার নামান্তর। এর বিরুদ্ধে সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতিবাদে রাস্তায় নামা প্রয়োজন। কত ছোট-বড় ঘটনায় ফেসবুক-ট্যুইটারে ঝড় ওঠে। অথচ দেশের সার্বভৌমত্বকে লুণ্ঠন করার এই চক্রান্তের পরেও সোস্যাল নেটওয়ার্ক-এ কোনো ঝড় উঠছে না কেন? বামপন্থীরা রাস্তায় নেমেছেন। সাধ্য মতো প্রতিবাদও করছেন। যা দেখে যথারীতি গাত্রদাহ শুরু হয়েছে কোনো কোনো মহলের। বলা হচ্ছে কলকাতায় মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে আর দিল্লীতে যন্তরমন্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালে বারাক ওবামার কি এল গেল?

হায়রে, যদি ভগৎ সিং বা ক্ষুদিরামও তাদের মতোই ভাবতেন! আমার ফাঁসি হলেই বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কি এল গেল! □

২৯ জানুয়ারি, ২০১৫

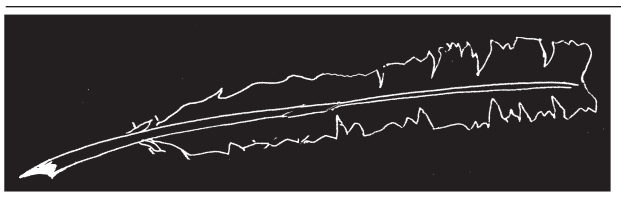

'ভ্রান্তি' আমার ক্ষমা কর প্রভু

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবিভক্ত বঙ্গের সাহিত্যাকাশে তাঁহার উদয়। ক্রমেই তাঁহার সৃষ্টির বহুমাত্রিক বিপুল প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যাঙ্গন। তাঁহার সৃষ্ট বিপুল সাহিত্য-পারাবারের গভীরে প্রোথিত থাকা অসংখ্য মনি-মুক্তার অন্বেষণে নিরন্তর চর্চা ও গবেষণায় নিয়োজিত হইয়াছেন বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিত্ব। সৃষ্টির পরিমাণগত বিস্তৃতি ও গুণগত ঔজ্জ্বল্য তাঁকে সাহিত্য জগৎসভায় অনন্যসাধারণ উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। তথাপি 'সাহিত্যিক' পরিচয় তাঁহার অসম্পূর্ণ পরিচয়। তিনি মানবতাবাদী দার্শনিক। তাঁহার জীবন-দর্শন ছিল ন্যায়বোধ জারিত। অন্যায়-অবিচার-বঞ্চনা - হিংসার ন্যায় অমানবিক উপসর্গগুলির বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী ও কণ্ঠ গর্জিয়া উঠিয়াছে বারংবার। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃংশস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে, মানব সভ্যতার ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদী ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সকলেরই অন্তরের আত্মীয়। আজও বঙ্গবাসী বিশ্বায়নী ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির প্রবাহে যে সম্পূর্ণ ভাসিয়া যান নাই, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই বিশ্বকবি। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই, বৎসরে অন্তত একবার হইলেও (২৫ বৈশাখ) বঙ্গবাসী শিকড়ে ফিরিবার তাগিদ অনুভব করে। স্বভাবতই বিশ্বকবিকে লইয়া এই বঙ্গে সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি যদি মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শন করেন তাহা হইলে সাধারণ জনের আহ্লাদিত হওয়াই উচিত। কিন্তু সমস্যা হইল উৎসাহ প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ যাহা ইতোমধ্যেই ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া সাহিত্যপ্রেমী বঙ্গবাসী ভিরমি খাইতেছেন।

বিশ্বকবি জীবিত ছিলেন আশি বৎসর। অর্থাৎ তাঁহার জীবনকাল আট দশকের। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। অথচ নব উত্থিত রবীন্দ্রপ্রেমী সম্প্রতি আমাদের অবহিত করিয়াছেন, এতদিন আমরা যাহা জানিয়াছি তাহা ভুল। বিশ্বকবি প্রকৃত প্রস্তাবে শেক্স্পিয়র ও কিট্সের সমকালীন। অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর কোনো এক সময় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে কিটস্ জন্মগ্রহণ করিবার পর, তাঁহার সহিত লন্ডনে বসিয়া ইংরাজী গীতাঞ্জলীর (সং অফারিংস) বিষয়বস্তু শলা-পরামর্শ করিয়াছিলেন। শুধুমাত্র ইহাই নয়, উক্ত রবীন্দ্রপ্রেমী আমাদের ইহাও জ্ঞাত করিয়াছেন যে বিশ্বকবি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত হন নাই। তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে যখন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা রোধ করিবার জন্য গান্ধীজী কলকাতার বেলেঘাটায় অনশনে বসিয়াছিলেন, তখন কবি ফলের রস লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিবার জন্য। অর্থাৎ আমরা যাহা শিখিলাম তাহা হইল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চার শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন! সম্ভবত বাস্তবতা রহিত এইরূপ তথ্য ম্যানুফ্যাকচার করিবার দক্ষতার কারণেই অস্তিত্ববিহীন একটি বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত রবীন্দ্র প্রেমীকে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি প্রদান করিয়াছিল। যদিও তাহা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের ন্যায় অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ট্র্যাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্রসঙ্গীত হইতে শুরু করিয়া সর্বশেষ কলিকাতা পুস্তক মেলা পর্যন্ত 'রবীন্দ্র চর্চা' যে অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আশঙ্কা হয়, হয়তো বা ভবিষ্যতে শুনিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হাট' কবিতায় যাহা বলিয়াছিলেন—'গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন'—তাহা অনুসরণ করিয়াই সমনামের এক ব্যক্তিকে সমকাজ অর্থাৎ পরিবহন দপ্তরের দায়িত্ব সঁপিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইহাও তাঁহার রবীন্দ্র অনুরাগেরই প্রতিফলন।

এমতাবস্থায় আমরা বঙ্গবাসীজন কবিগুরুকে এই বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী হইতে পারি। নচেৎ অনাগত ভবিষ্যতে কিম্ভূত তথ্যবানের সম্মুখীন হইতে হইবে। □

১৪ মাঘ, ১৪২১

শোক সংবাদ

মিহির চট্টোপাধ্যায়

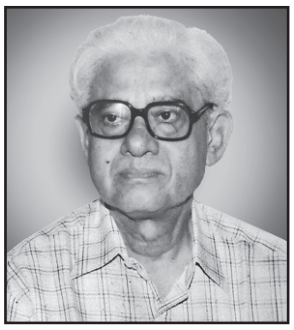

পশ্চিমবঙ্গ সাব অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও সংগঠন সম্পাদক কমরেড মিহির চট্টোপাধ্যায় এক বেসরকারী নার্সিংহোমে ফুসফুসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ ডিসেম্বর মধ্যরাতে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র বর্তমান।

জন্ম ১৯৪২ সালের ৫ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশে। দেশভাগের পর সপরিবারে এদেশে চলে আসেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯৬২ সালে বিএসসি পাস করেন। ১৯৫৮ সালে কলেজে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন ও প্রেসিডেন্সি জেলে হাজত বাস করেন। ১৯৬১ সালে কলেজ ইউনিয়নের এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন।

১৯৭২ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন দপ্তরের বজবজ সাব ডিভিশনে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) পদে যোগ দেন। ১৯৮৫ সালে সমিতির সংগঠন সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০২ সালে চাকুরীজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ও পেনশনার্স সমিতির সাথে যুক্ত হন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী মতাদর্শে দৃঢ়চেতা ও কর্মচারী সংগঠন-সংগ্রাম ও আন্দোলনের এক অগ্রণী সৈনিক।

গত ১০ জানুয়ারি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর গুণাবলীকে অনুসরণের আহ্বান জানান। □

যশোধরা বাগচী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নারীর সমানাধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ যশোধরা বাগচী গত ৯ জানুয়ারি সকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হন। তিনি কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৭৭।

তাঁর স্বামী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমিয় বাগচী ও দুই কন্যা বর্তমান। তিনি ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরবর্তী পর্যায়ে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে পড়াশোনা করেন। কলকাতায় ফিরে তিনি লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপনা করেন। শিক্ষিকা হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। ১৯৮৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ বা মানবী বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র চালু হয়। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা।

অবসর গ্রহণের পর তিনি ২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন ছিলেন। তিনি এই সময়কালে রাজ্যে মহিলাদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন। আক্রান্ত নারীদের পাশে দাঁড়াতে তিনি বার বার ছুটে গেছেন রাজ্যের নানা প্রান্তে।

২০০৫ সালে তিনি 'দ্য চেঞ্জিং স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ওয়েস্টবেঙ্গল ১৯৭৭-২০০০— দ্য চ্যালেঞ্জেস অ্যাহেড' নামে গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

যশোধরা বাগচী বামপন্থী নারী আন্দোলনের একজন সক্রিয় শরিক ছিলেন। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ কমিটির মুখপত্র 'এক সাথে' পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। □

ধর্মস্থানের ধ্বংসসাধন

রোমিলা থাপার

[ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পরবর্তী তথা শেষাংশ]

ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে পবিত্র তীর্থস্থান বা ধর্মীয় স্থানগুলির ধ্বংসসাধন বা আক্রান্ত হবার ঘটনার পিছনে একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসই কারণ হিসেবে কাজ করেছে এমন ভাবলে ভুল হবে। লোভ ও ক্ষমতার দম্ভও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদান। বাবরি মসজিদের ধ্বংসসাধনের পিছনে ধর্মীয় শত্রুতার থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বাসনা অনেক বেশি কাজ করেছে।

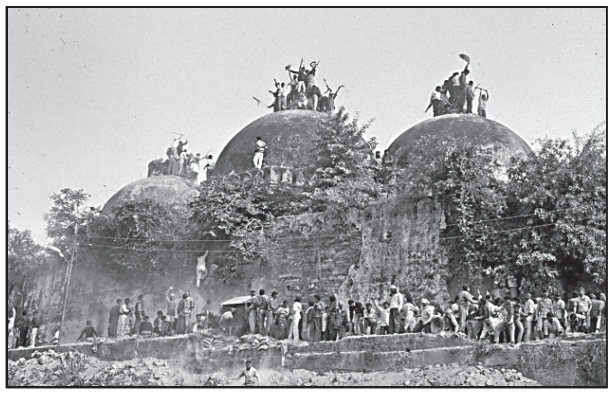

মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, কিন্তু তার কারণ শুধুমাত্র ধর্মীয় বিদ্বেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সম্পদ আহরণ এবং ক্ষমতায় আরোহণও কারণ হিসেবে কাজ করেছে। যেখানে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়, তা ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন, এবং সেই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকমণ্ডলীর অস্তিত্ব থাকে, যেমন সম্পদশালী মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে ছিল, সেখানেই অ-ধর্মীয় উপাদান যুক্ত হয়ে পড়ে। অতীতে যে সমস্ত মন্দির রাজনৈতিক টানাপোড়েনের শিকার হয়েছে, সেগুলির ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ সত্য বলে প্রমাণিত হবে। মোঘল, বুন্দেলা বংশ এবং রাজপুতদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, তার জেরেই মথুরায় মন্দির নির্মিত হয়েছিল, এমনকি ধ্বংসও হয়েছিল।

এরপরেই আলোচনায় আসবে, প্রচারিত মত অনুযায়ী হিন্দুদের দ্বারা বাবরি মসজিদের ধ্বংস সাধন। এক্ষেত্রেও ধর্মীয় বিদ্বেষকেই কারণ হিসেবে সামনে আনা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনায় যুক্ত কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার অভিমত হল ধর্মীয় কারণের থেকেও রাজনৈতিক কারণই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদ ধ্বংস করার জন্য সমবেত মানুষ ঠিক তেমনই আচরণ করেছিল, যে আচরণের তারা নিজেরাই নিন্দে করত।

ধর্মীয় বিদ্বেষকে উস্কে দেবার জন্য প্রচার করা হয়েছিল একটি মন্দির ধ্বংস করেই নাকি বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। আরও বলা হল, ঐ মন্দিরটি রামচন্দ্রের প্রকৃত জন্মস্থানের উপর নির্মিত হয়েছিল। নুরানি সংকলিত গ্রন্থটিতে, অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে বেশ কয়েকজন বিদ্বজ্জন ব্যক্তির মতামত জানা যায় যাঁরা এ ধরনের কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

যারা বাবরি মন্দির ধ্বংস করেছিল, তারা নিজেদের কৃতকর্মের পক্ষে যে যুক্তি সাজিয়েছে, তা ইতিহাসবিদদের কিছুটা সমস্যায় ফেলেছে। এর মধ্যে সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয় হল, রামচন্দ্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব। সাম্প্রতিকতম একটি মামলার তিনজন বিচারকের মধ্যে একজন বিচারকের অভিমত হল, আজ থেকে ঠিক আশি লক্ষ বছর আগে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন! অথচ আমরা জানি ঐ সময়ে এই উপমহাদেশে মানবপ্রজাতির কোনো চিহ্নই ছিল না।

রামকথার বহুমুখিনতা

রামকথার বহুমুখিনতা বা বৈচিত্রময় উপস্থাপনাতে এখন আপত্তি তোলা হচ্ছে। অথচ এই বৈচিত্রময় উপস্থাপনা এতদিন পর্যন্ত যথেষ্ট সমাদৃত ছিল এবং এগুলির মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন ভাষায় বেশ কয়েকটি উন্নত কাব্যগুণ সম্পন্ন রামভক্তির নিদর্শন রচিত হয়েছে। তাহলে এখনই বা কেন আমরা শুধুমাত্র একটি উপস্থাপনাকেই সত্য বা বাস্তব বলে গ্রহণ করে বাকিগুলিকে অসত্য বা অবাস্তব বলে বাতিল করব? অতীতে তো কখনও এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়নি?

রামকথার মতো একটি সমৃদ্ধ কাহিনী বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন ভাষায় নানান গোষ্ঠীদ্বারা লিখিত-পুনর্লিখিত হয়েছে বলেই, বহু মানুষের কাছে এটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উপাদানে পরিণত হয়েছে। রামকথার প্রতিটি সংস্করণে সমাজের কোনো না কোনো অংশের প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয় এবং এইভাবে এই কাহিনী সমাজ জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। এইভাবেই এটি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং এশিয়ার বিভিন্ন অংশের সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতেই প্রতিটি অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায় রামকথার নতুন নতুন সংস্করণ রচনা করেছে এবং সেগুলিই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। এইভাবে ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শতাধিক সংস্করণ রচিত হয়েছে এবং একটির সাথে আরেকটির লক্ষ্যণীয় পার্থক্য সত্ত্বেও, প্রতিটিকেই সত্য বা প্রামাণ্য বলে দাবি করা হয়েছে। খ্রীস্টাব্দের একেবারে সূচনাপর্বে লিখিত জৈন সংস্করণ 'পৌনচারিয়াম'-এ দাবি করা হয়েছে, এটি অন্যান্য যে কোনো রামকথার তুলনায় অনেক বেশি তথ্যনিষ্ঠ। এই সংস্করণ সাধারণভাবে বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করলেও কোথাও কোথাও পার্থক্যও রয়েছে। এরও বেশ কিছুদিন পরের একটি সংস্করণে 'ছায়া সীতা'-র কথা বলা হল। যখন সীতা অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হলেন, তখন তাঁর পরিবর্তে এগিয়ে এলেন 'ছায়া সীতা' এইভাবে সীতা অগ্নিপরীক্ষার হাত থেকে রেহাই পেলেন। মধ্যযুগে মালয়েশিয়ায় রচিত হয়েছিল 'হিকায়াত সেরি রাম'। এখানে দেখানো হল 'আল্লাহ রাবণের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিয়েছিলেন এবং রামের পরিবারের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির যে বৈচিত্র তা-ই বিভিন্ন সংস্করণে প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের আগ্রহের বিষয় হল রাম কথার প্রতিটি পুনর্নির্মাণ প্রয়াসের আকার, বিন্যাস এবং উদ্দেশ্য। কয়েকটি সংস্করণে ভাষার ব্যবহার যথেষ্ট কাব্যগুণ সম্পন্ন। যেমন বাল্মিকীর রামায়ণ। অন্যান্যগুলি মূলত লোক-কাহিনীর আধারে রচিত। এগুলির মধ্য দিয়ে বর্তমান ভারতীয় সমাজের তুলনায় তৎকালীন অনেক বেশি উন্মুক্ত ও পরিবেষ্টক সমাজের ছবি পাওয়া যায়। যদিও এমন অনেকগুলি সংস্করণই কোথাও কোথাও বে-আইনী ঘোষণা করে বাতিল করা হয়েছে। যদিও বাতিল সংস্করণগুলির অধিকাংশই আমাদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে, তবুও একমাত্র বাল্মিকীর রচনা ছাড়া বাকি সবই নাকি হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করে।

যদি প্রশ্ন করা হয় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে কি লাভ হল? বলা হচ্ছে এটি নাকি সোমনাথ মন্দিরের ওপর মাহমুদের আক্রমণের প্রতিশোধ। প্রতিশোধ নেওয়া হল প্রায় এক হাজার বছর পরে? তাহলে কি আমরা ইতিহাস খুঁজে অতীতের ঘটনার প্রতিশোধ নিতে থাকব? এবং কখনও কখনও সেগুলিকে বিপরীত দিকে নকল করে? কোন্ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে হবে, কারাই বা প্রতিশোধ নেবে, এসব ঠিক করার দায়িত্বই বা কাদের? যদি সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় যে অতীতের কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে, তাহলে পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্য বহু ঘটনাই রয়েছে। এমনকি কাশ্মীরের রাজা হর্ষদেবের কৌশলও। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল একটি সংরক্ষিত সৌধকেও রক্ষা করতে রাষ্ট্র ব্যর্থ। তাহলে কি আমরা ধরে নেব রাজনৈতিক নেতারা যা চাইবেন তা-ই ধ্বংস করতে উন্মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী অনেকগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়েছে, যা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক। আমরা কি শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলীকে বিচার করব? ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোত জড়িত অন্যান্য উপাদানগুলি বিচার্য বিষয় হবে না? এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করার ধারা কি সমসাময়িক রাজনীতিকেও প্রভাবিত করবে? অতীতকে বিচার করার এই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে কি আমরা বেরোতে পারি না?

আমাদের মনে রাখা দরকার, আমরা যখন ভারতে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করি—তা সে যে ধর্মই হোক না কেন—আমাদের নিজেদের কাছেই প্রশ্ন করা উচিত—কাদের ধর্মের কথা আমরা আলোচনা করছি? সমাজের নীচুতলার এক বিপুল অংশের জনগণ—হিন্দু দলিত ও নীচু জাতি, মুসলমান আরজাল সম্প্রদায় এবং শিখ ধর্মের মজহাবি গোষ্ঠী—বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে গিয়ে ধর্মাচরণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাই মন্দির, মসজিদ বা গুরুদ্বারের সাথে এঁরা একাত্মবোধ করতেন না। তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনমতো ধর্মাচরণ কেন্দ্র তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ধর্মপালনের জন্য মোটা অঙ্কের অনুদান প্রাপক ধর্মস্থানের প্রয়োজন নেই। তাঁদের কাছে পছন্দ মতো ভাষা ও পদ্ধতিতে পছন্দমতো দেবতাকে উপাসনা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করাই হল ধর্ম। এই 'ভক্তি'-ই তাঁদের ধর্মের চালিকাশক্তি। এই ভক্তিই তাঁদের মন্দির-মসজিদ ধ্বংসের লুণ্ঠনমূলক রাজনীতি থেকে রক্ষা করেছে। □

(সমাপ্ত)

অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ফ্রন্টলাইন, জানুয়ারি ৯, ২০১৫

গেরুয়াধারীদের হাতে অধঃপতিত ১০২তম বিজ্ঞান কংগ্রেস

আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের প্রথম এবং প্রধান সংগঠন ''ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস'' (The Indian Science Congress Association-ISCA) ১৯১৪ সাল থেকে দেশে বিজ্ঞানের প্রসার এবং উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে প্রতি বছর ''বিজ্ঞান কংগ্রেস'' (Indian Science Congress—ISC) বিশেষ দিককে সামনে রেখে বিজ্ঞান-কংগ্রেস পরিচালিত করে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে। সেইমতো ''শত-বৎসর'' (১০০ বছর) প্রচুর উদ্দীপনার সাথে জানুয়ারি '২০১৩ সালে কলকাতাতে—''কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে'' (Calcutta University) উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। এবার ১০২ বছর উদ্‌যাপন করা হল মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Mumbai) ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু এবার এই কংগ্রেস পরিচালনা পুরোপুরি বিপথে পরিচালিত করে ছিল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার। খোদ প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতার মাধ্যমে দিক নির্দেশ করে দিলেন। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সময়ে দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞানের যে প্রভূত উন্নয়ন সাধন হয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন শাখায় যেমন পরিকাঠামোতে (Infrastructure), যোগাযোগে (Communication), বিদ্যুতেও সৌরশক্তির (Production of energy & power), খাদ্য উৎপাদনে (Food materials), জরুরী ও প্রসাধনী উৎপাদনে (Essential & luxuary prducts) বিস্তারিত বিষয়কে মানুষের গোচরে নিয়ে আসা ও তার সাথে সাধারণ মানুষ ও সমাজের কল্যানের জন্য উন্নতির রূপরেখা তৈরি করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির (Science & Technology—S & T) এই অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও দেশে দেশে এমনকি উন্নততর দেশেও বেশির ভাগ মানুষই এর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উপরন্তু বলা যায় এই প্রভূত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতিকে মানব সভ্যতার ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন মারাত্মক ধ্বংসকারী অস্ত্র ইত্যাদি (weapons of massdestruction warfare) জিনিস তৈরি করে নানা দেশে প্রয়োগ করছে। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক নেতাদের পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষাতে শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ইত্যাদি উন্নতির ধোঁয়া-ছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। মানবজাতীর উন্নয়ন সূচক (Human Development Index—HDI) ধরলে আমাদের দেশের স্থান ১৮৭টি দেশের মধ্যে ১৩৫তম (as per Human Development Report—HDR 2014 by the UNDP)। বছরে বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট দেখলেই বোঝা যাবে কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক নেতারা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে গেছে। এনডিএ-র আমলে এবং বর্তমান আরএসএস পরিচালিত বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ও বিজ্ঞানকে

গেরুয়াবাহিনীর সহযোগিতায় বিকৃত করার চেষ্টায় আছে। ১০২তম সম্মেলনে এবং এই সময়কালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন রাখ ঢাক না করেই বলে ফেললেন গণেশের মাথায় হাতীর মাথা লাগানোটা নাকি প্রমাণ করে যে প্লাস্টিক সার্জারি ভারতবর্ষে বহু বছর আগেই প্রচলিত ছিল! এটা আগের মুনি-ঋষিদেরই অবদান। শুধু তাই নয় বিকাশপুরুষ পণ্ডিতবর কর্পোরেট সমাজের চিন্তাবিদ বিজ্ঞের ন্যায় মত দিলেন যে মহাভারতে কৌরবদের জন্ম প্রমাণ করে যে টেস্ট টিউব (Test Tube) বেবির আবিষ্কারও এই প্রাচীন ভারতে অনেক আগেই হয়েছিল।

আবার এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী হর্ষবর্ধন হাসকোর দাবি করলেন যে পিথাগোরাসের তত্ত্ব ও বীজগণিতের আবিষ্কারক ভারতীয়রাই। এক সময়ে কেরালার এক পাইলট ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন অনিজ জে বোডাস দাবি করে বসলেন বৈদিক যুগে ভরদ্বাজ মুনি নাকি বিমানের প্রকৃত আবিষ্কর্তা। আজ থেকে ৭ হাজার বছর আগে ঐ বিমান জানিয়েছিলেন ভরদ্বাজ। এমনকি ঐ সময় বিমানের আকার বর্তমান বিমানের চেয়ে ৬০০ গুণ বড় ছিল। শুধু তাই নয় গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দিত সেই বিমান। যত অবাস্তব ও অবান্তর কথাবার্তা বিজ্ঞান কংগ্রেসে অবলীলাক্রমে বলা হলো। শুধু তাই নয় এই ধরনের বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া হল ''বিজ্ঞান-কংগ্রেসে''। প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, স্নায়ুশাস্ত্র, যোগচিকিৎসা এমনকি শল্য চিকিৎসা নিয়ে নানা বক্তা উদ্ভট সমস্ত কথা বলে গেলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসকে কলুষিত করে। ১২জন বক্তার মধ্যে মাত্র ৮ জন বক্তাকে বলতে দেওয়া হল নির্ধারিত সময়ের বাইরেও। সভাতে উপস্থিত করা হল নানা ধর্মীয় সংগঠন ও সংস্কৃত স্কুল ও কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এসে। পরিকল্পনা করে বিজ্ঞান চর্চা করতেই দেওয়া হল না। প্রকৃত বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা এর প্রতিবাদে সভা ছেড়ে চলে যান। এককালের আরএসএস-এর ধর্ম প্রচারক ও বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ও গেরুয়াবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে বিজ্ঞান কংগ্রেস কলুষিত হল। আজ দেশের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকারের নগ্ন চেহারা। এর বিরুদ্ধে এখনই সোচ্চার হতে হবে বিজ্ঞানমনস্ক সাধারণ মানুষকে। □

প্রিয়ব্রত ভৌমিক

পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ

তপন সেন, সাধারণ সম্পাদক, সি আই টি ইউ

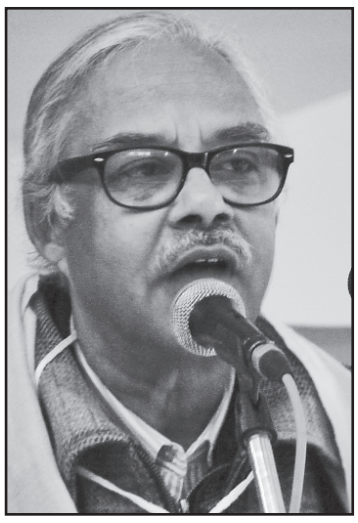

সম্মেলনের শুরুতেই যে সুযোগ আমি পেয়েছি সেই সুযোগে কিছু চিন্তাভাবনা আমি আপনাদের সাথে ভাগ করতে চাই। একজন সাংসদ হিসেবে নয় একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে। যদিও এই বাইরের লড়াইয়ের কথা আমরা একই সাথে সংসদে তুলে ধরি।

আপনারা আজ ৮০ লক্ষের উপর শ্রমিক কর্মচারীদের একটি এককভাবে বৃহত্তম কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রতিনিধি যারা প্রশাসনে আছেন, নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, বিশেষ করে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের পর একদিকে নয়া উদারনীতির আক্রমণ, অন্যদিকে শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যের উপর যে আঘাত আপনাদের উপর নেমে এসেছে যা আগের লড়াইকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

নয়া উদারনীতির আক্রমণ শুধু আমাদের দেশে না, সারা পৃথিবীতে যে দেশে যেমন বাস্তবতা, সেই দেশে তদনুযায়ী সচেতনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। মিডিয়া যে হামলা করছে তার বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা করাই রাস্তা আমাদের। লোকের মনের মধ্যে সহজাত যে আক্রোশ আছে তাকে সংগঠিত সচেতন শ্রেণীসংগ্রামের রূপ দেওয়াই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের কাজ। শাসক শ্রেণী সবসময় চায় সমাজের মধ্যে বিভাজন করে রাখতে। পুঁজিবাদ, সঙ্কট থেকে বাঁচতে, মুনাফাকে স্থিতিশীল রাখতে এটা করে যাতে প্রতিরোধ জোরদার না হয়। তাই ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে, পরিচিতি সত্তার রাজনীতির নামে, কখনো পোস্ট মর্ডানিজমের নামে আমাদের বিভক্ত করতে চায়। এগুলি কোনোটাই বিচ্ছিন্ন নয়। ওদের সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ। শোষণের অঙ্গ। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৫তম জাতীয় সম্মেলনের সামনে এই আক্রমণের স্বরূপ নিয়ে সার্বিক বোঝাপড়া নিজেদের মধ্যে তৈরি করা, ওদের পরিকল্পনা অনুধাবন করা হোক অন্যতম কেন্দ্রীয় আলোচ্য প্রসঙ্গ। শুধু নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়া তৈরি করা নয় গোটা সমাজের মধ্যেও এই বোঝাপড়া তৈরি করা সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনের কাজ। এটা আমরা করতে না পারলে আর কেউ পারবে না। কর্মচারী আন্দোলনের সামনে কেন্দ্রীয় কাজ হচ্ছে ঐক্যকে অটুট রাখা, সম্প্রসারিত করা।

১৫তম সম্মেলন এটাও পর্যালোচনা করবে কী করে এই অবস্থায় এলাম। বিশেষ করে ২০১৪-এর পর। আমরা এই নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করেছি, জেলে গেছি, ছাঁটাই হয়েছি, সংগ্রাম পরিচালনা করেছি তাও এমন কেন হল? ২০১৪-র জুলাইয়ে কাউন্সিল সভায় সিটু এটা নিয়ে পর্যালোচনা করে। এই যে ওয়েজ কাট, বেসরকারীকরণ ইত্যাদির মূলে কি? কোন্ নীতির ফলে এই আক্রমণ তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাই 'আচ্ছে দিন আয়েগা'র স্লোগানে জনতা ভেসে গেছে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন ঘোর সঙ্কটে। এই সঙ্কট থেকে বাঁচবার জন্য উৎপাদনে পুঁজি কমছে। জুয়া, সাট্টা খেলতে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে শেয়ার মার্কেটে। খরচ কমাতে নিয়মিত শ্রমিক কমছে, বাড়ছে চুক্তিতে অস্থায়ী শ্রমিক, অনিয়মিত শ্রমিক। কাজের আউটসোর্সিং হচ্ছে এবং সর্বোপরি জনতার জন্য পরিষেবায় খরচ কমছে। আমাদের দেশে রেগায় খরচ কমাচ্ছে। পেট্রোল ডিজেলে ভরতুকি তুলে বিনিয়ন্ত্রণ হয়ে যাচ্ছে। এখন পেট্রোল ডিজেলের আন্তর্জাতিক বাজারে দাম যত কমেছে আমাদের তত কমছে না। যখন দাম বাড়ছে তখন তার বোঝা আমাদের উপর চাপছে—যখন আন্তর্জাতিক দাম কমছে তখন তার সুফল পাচ্ছে পুঁজিপতিরা। ফিসক্যাল ডেফিসিট কম করো তার বোঝা চাপাও জনতার উপর। সব জায়গায় পি পি পি। অর্থাৎ পাবলিকের মানিতে প্রাইভেটের লুঠ। স্কুল, হাসপাতাল সরকার করবে না, যাতে ব্যবসাদাররা ব্যবসা করতে পারে। মনমোহনের শুরু করা কাজ দারুণ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মোদী। সারে ভর্তুকি কমিয়েছে পরে তুলে দিয়েছে—উঠে গেছে সার কারখানা মনমোহন জমানায়। তখন বিজেপি সাপোর্ট করেছে আর এখন এই নীতিকে রূপায়িত করছে জোরকদমে। এর বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার লড়াই করছি। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনও এই লড়াইয়ের শরিক, আপনাদের ছাড়া এই লড়াই সম্ভব নয়। আমরা কিছু সফলতাও লাভ করেছি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আমাদের খুঁজে বার করতে হবে আমাদের দুর্বলতা। আমরা পর পর ধর্মঘট করেছি। এখনো বীমা, ব্যাঙ্ক বিল পাশ হয় নি যৌথ সংগ্রামের জন্য। কিন্তু আমাদের এই লড়াইয়ের কথা আমরা জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পারি নি।

এখন জমানা আরও ভয়ঙ্কর। যখন নির্বাচন আসবে 'দাঙ্গা বাঁধাবে', 'জাতপাতের লড়াই' করবে। এক মন্ত্রী বলছে 'রামজাদা রহেগা-হারামজাদা যায়েগা'। পেশোয়ারে সন্ত্রাসবাদী হানায় ১৩২ জন মারা গেল, সারা পৃথিবী জুড়ে শোক। আর বিজেপি নেতা আদিত্যনাথ ট্যুইট করছে, 'পাকিস্তানের মুসলিম ছেলেদের মুসলিমরা মেরেছে আর ভারতের মিডিয়া কাঁদছে।' এটা কী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য? একদমই নয়—এটা পুঁজিপতিদের স্বার্থে। বিভেদ করার অপারেশন সারা দুনিয়া জুড়ে চলছে। যে লুঠেরা আর ক্রিমিনালরা এখন দুনিয়া চালাচ্ছে—তাদের রাজনৈতিক এজেন্টকে রেখে লুঠ চালাচ্ছে তারা হচ্ছে পুঁজিবাদ। কী কেন্দ্রে, কী বহু রাজ্যে। জনতার রাজনৈতিক নিরক্ষরতার সুযোগ নিচ্ছে। যদি আমরা কার্যকরীভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি তবে একটা ফল পাওয়া যাবেই। শুধু ইস্যুর বিরুদ্ধে নয়, নীতির বিরুদ্ধে আমাদের বোঝাবুঝি পরিষ্কার করতে হবে।

আমরা টিভির মাধ্যমে পৌঁছতে পারি না। কর্পোরেট মালিকানাধীন মিডিয়া মোদী বন্দিত মিডিয়া সম্পর্কে বোঝা দরকার। আমজনতা টিভিতে রাজনৈতিক তরজা দেখে না, সিরিয়াল দেখে, ফিল্ম দেখে। আমাদের কথা নিজেদের নিয়ে পৌঁছতে হবে তৃণমূল স্তরে। শুধু অ্যাক্টিভিস্টদের বুঝলে হবে না। নিশ্চিতভাবে এটা সম্মেলনে আলোচনা হবে।

বীমা বিল তৈরি। এটা সিলেক্ট কমিটিতে যাবে এবং কংগ্রেস বসেই আছে সমর্থন দেওয়ার জন্য। কী হবে? যদি বীমা বেসরকারীকরণ হয় হয়তো বিনিয়োগ প্রাথমিকভাবে বাড়বে তারপর আমাদের পয়সা নিয়ে সাট্টা খেলবে বীমা রাক্ষসরা। কোথা থেকে বিনিয়োগ আসবে? আমেরিকা-ইওরোপ? ওদের অর্থনীতির হাল খারাপ। বীমাতে পুঁজি আসা মানে শিল্প হবে না। পেনশন বিল-এ কেউ যদি মনে করে বেশি পেনশন পাবো—ভুল। ওরা নিজেদের দেশে দিতে পারছে না—এখানে দিতে আসবে কেন? অথচ বহু মানুষ বিভ্রান্ত। খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই। একটা দোকান খুললে দশটা দোকান বন্ধ হবে। যত কাজ হবে তার দশ গুণ কাজ বন্ধ হচ্ছে। কী হয়েছে শেষ ছ'মাসে? শিল্প উৎপাদন কমেছে। রাজস্ব আদায় কমেছে। যদি আমাদের দেশে ক্রয়ক্ষমতা কমে তাহলে এমন কোনো বেকুব নেই যে এখানে এসে পয়সা ঢেলে শিল্প বানাবে। অথচ মিডিয়া এই মিথ্যাটাই রোজ বলে যাচ্ছে। আর জনতার একটা অংশ তা বিশ্বাস করে। আমাদের দুর্বলতা অনুগামীদের মধ্যে সত্যটা নিয়ে যেতে পারছি না। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কর্মচারীদের উপর শোষণ আরও মারাত্মক। এদের যুক্ত না করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হবে না। শ্রম আইন পরিবর্তনের ফলে এরা দারুণ আক্রান্ত। আগে ১০ জনের বেশি শ্রমিক কোনো সংস্থায় শ্রম আইন সুরক্ষার সুযোগ পেত, এখন এটা ৪০ জন করে দেওয়া হয়েছে। ১ থেকে ৩৯ জন শ্রমিক কোনো সংস্থায় থাকলে তারা সবরকমের শ্রম আইনের আওতার বাইরে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। একটা শ্রেণী সচেতনতা, শ্রেণীসংগ্রামই একে প্রতিরোধ করতে পারে। সারদা, চিটফান্ডগুলি জনগণের টাকা লুঠ করছে, যা গরিবের মধ্যে জনপ্রিয় কী করে হল? কারণ মহামান্য সরকার স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ কমিয়েছে, তাই জনগণের মধ্যে, গরিবের কাছে স্বল্প সঞ্চয়ের জনপ্রিয়তা কমেছে। উৎসাহিত করেছে চিটফান্ডে টাকা রাখতে এবং স্বল্প সঞ্চয়ের এজেন্টদের কমিশন কমিয়েছে বিপুলভাবে। ফলে অভিজ্ঞ দক্ষ এজেন্টরা চিটফান্ডের এজেন্ট হতে বাধ্য হয়েছে পেটের দায়ে। সামগ্রিক পরিকল্পনা। বেশির ভাগ রাজ্যসরকারগুলি এই লুটেরাদের এজেন্ট। একই অবস্থা এল আই সি-তেও। এজেন্টদের কমিশন কমিয়েছে যারা বীমার ভরসা।

কয়লা খনির বেসরকারীকরণ নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ লড়াই করছি, করতে চাই। বিএমএস সহ অন্যরা পিছু হটলেও, যখনই ওরা বাধ্য হবে লড়াই করতে আমরাও যোগ দেব তাতে। এটাও আমাদের কৌশল। যে কোনো মূল্যে জনগণের জন্য, শ্রমিকের জন্য এই নীতির বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো সর্বশক্তি দিয়ে।

আপনারা সমস্ত বিষয় ভাববেন। আপনারা নিশ্চিত এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা যেভাবেই হোক এই লড়াইয়ে এক বিন্দু জমি ছাড়বো না। □

অনুলিখন ঃ মানস দাস

জাতীয় সম্মেলনের মহিলা অধিবেশন

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন-এর পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয়দিনের প্রথমার্ধটি মহিলা অধিবেশন হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল। এই অধিবেশন উদ্বোধন করেন অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব ওয়ার্কিং উইমেন-এর আহ্বায়ক কে হেমলতা। হেমলতা তার বক্তব্যে বলেন যে কর্মরত মহিলারা প্রভূত অসুবিধা ভোগ করেন। শ্রমজীবী শ্রেণী কিছু সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য যেমন বর্তমানে লড়াই চালাচ্ছে তেমনই শাসকশ্রেণী শ্রমজীবী মানুষকে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পরিস্থিতিতে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। মাস ছয়েক আগে আমাদের বলা হল যে 'ভালো দিন আসছে'। কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতার জন্য সারা দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি ক্রমশই সঙ্কটময় হয়ে পড়ছিল। লক্ষ-কোটি টাকার দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়ছিল সারা দেশ। এই পরিস্থিতিতে বীতশ্রদ্ধ মানুষ নরেন্দ্র মোদী এবং - বি জে পি-র পক্ষে ভোট দেন, কিন্তু ভোটের পরে তারা কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। আম্বানী এবং আদানিদের জন্যই শুধু ভালো দিন এসেছে।

ব্যাঙ্কে অর্থ রাখার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি হয় না। সম্পদ সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র শ্রমিকের শ্রমের মধ্যে দিয়ে। তাই মোদী বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে এখানে আমন্ত্রণ করছেন যাতে এখানকার শ্রমশক্তি খুব সস্তায় ক্রয় করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলি তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। এই কারণেই শ্রম আইন সংস্কার করা হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা নিরাপত্তামূলক আইনের আওতার বাইরে চলে যায়। মহিলা কর্মীদের উপরেও এই সংস্কারের তীব্র অভিঘাত পড়বে। আমাদের মনে রাখতে হবে ৯৬% মহিলা শ্রমিক-কর্মচারীরা কোনো রকম নিরাপত্তামূলক আইন দ্বারা সুরক্ষিত নন।

আগামী বছর আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পের ৪০ বছর পূর্ণ হবে। এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালনা করে। সব রাজ্যগুলি মিলিয়ে ৭৫ লক্ষ মহিলা কর্মচারী এই প্রকল্পে কাজ করেন। এদের সমাজকর্মী বলা হয়, শ্রমিক বলা হয় না, আবার 'আশা' প্রকল্পের মহিলা কর্মীদের এমনকি সমাজকর্মীও বলা হয় না, তাদের বলা হয় অ্যাক্টিভিস্ট। এদের শুধু কিছু ইনসেনটিভ দেওয়া হয়। এন.আর.এল.এম. প্রকল্পের মহিলাকর্মীরা পারিশ্রমিক হিসেবে 'সার্ভিস চার্জ' গ্রহণ করেন।

এই প্রকল্প(Scheme)-এর সবথেকে বড় সমস্যা হল যে কোন সময়ে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে লাখো-লাখো কর্মীরা যে কোনো মুহূর্তে চাকুরীচ্যুত হতে পারেন। সমস্ত কর্মীদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং স্বাস্থ্য বীমার মতো ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে হবে।

বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিবদ্ধ/ সাময়িক কর্মীদের নিয়োগের ফলে স্থায়ী ধরণের শ্রমিক/কর্মী নিয়োগ প্রায় বন্ধ। এর ফলে শ্রমিক/কর্মীদের পিছনে খরচ যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনই শ্রমিক/কর্মচারীদের স্থায়ী/অস্থায়ী কর্মী— এই দুটিভাগে আড়াআড়িভাবে ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

মাতৃত্বকালীন আইন, সমকাজে সমবেতন আইন— এই ধরনের বেশকিছু আইন আছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৯৬% মহিলা কর্মীরা সমকাজে সমবেতন পান না গড়ে একজন মহিলা কর্মী একজন পুরুষ কর্মীর ৬০% বেতন পান। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ নেই। বিশেষ অর্থনতিক অঞ্চলগুলিতে অবস্থা আরও খারাপ। এই অঞ্চলগুলিকে মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। এইসব বিশেষ অঞ্চলগুলিতে মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা নেই। এমনকি টয়লেট যাওয়ার জন্য মাত্র ৫-৬ মিনিট সময় নির্ধারিত থাকে। ১৯৭৭ সালে সুপ্রীম কোর্ট যৌন হয়রানি বিরোধী আইন পাশ করতে সরকারকে নির্দেশ দিলেও মাত্র গতবছর তা কার্যকরী হয়েছে। সেক্ষেত্রে মহিলাদের চরিত্র হনন, খুব তুচ্ছ কারণে তাদের হয়রানি করা— ইত্যাদি ঘটনা নিয়মিতই ঘটে।

এর সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ। সাম্প্রদায়িকতা শ্রমজীবী মানুষকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভাগ করে দিতে চাইছে যা শ্রমজীবী মানুষের

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

কে হেমলতা

সুতপা হাজরা

শিখা মুখার্জী

সবিতা

রত্না সরকার

থেবিল্লামানি

বর্তমান পরিস্থিতি ও শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য

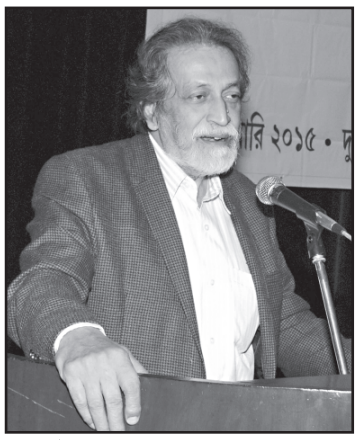

ডঃ প্রভাত পট্টনায়ক

আপনারা আমায় এই অনুষ্ঠানে ডেকেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার বাংলায় বলার বেশি অভ্যাস নেই, আমি একটু বাংলা, ইংরেজি মিশিয়ে বলব। এর জন্য আগে থেকে ক্ষমা চাইছি।

জ্যোতিবাবুর সাহস বিষয়ে মনোজবাবু বললেন, সাহসের একটা উদাহরণ আপনারা হয়তো জানেন, যখন ১৯৬৭-এ 1st United Front Government এসেছিল, আমি এই উদাহরণটি দিচ্ছি কারণ আমি তখন খবরের কাগজে পড়েছি যখন ১৯৬৭-এ 1st United Front Government এসেছিল তখন সারা ভারতবর্ষে একটা হই হই উঠেছিল যে—একটা Communist Government Bengal-এ? Bengal একটা বড় state। কেরল ছোট state, সেখানে আগে ছিল Communist Government। কিন্তু Bengal-এ যখন Communist led Government হল—United Front Government—কিন্তু ওটাতে Communist সদস্য বেশি ছিলেন, তখন সারা ভারতে একটা হই হই হল। অনেক কিছু শুরু হল। এক সময় একটা Police attack হল on the Assembly premises. যত এম এল এ ছিলেন সবাই দরজা দিয়ে, জানলা দিয়ে চলে গেলেন বাইরে, যখন পুলিশের লোকগুলো এল শুধু জ্যোতিবাবু নিজের অফিসে বসে থাকলেন। পুলিশের লোকেরা ঘরে ঢুকে তাঁকে ঘিরে রেখে, তাঁকে ঘেরাও করলেন। জ্যোতিবাবু একেবারে unflappable। Unflappable। জ্যোতিবাবু বললেন, ঠিক আছে। তোমরা এখন আমায় যা কিছু করতে চাও, করতে পার। কিন্তু, যখন জনতা বাইরে থেকে আসবে তোমাদের কে বাঁচাবে। জ্যোতিবাবুর এই যে এত সাহস, এত জনতার ওপর ভরসা, এরকম আর কোনো political leader-কে অন্তত আমি দেখিনি। এত সাহস আর কারো ছিল না। আর এর পেছনে ছিল একটা Confidence একটা theoretical commitment যে আমাদের victory হবে। আমরা জিতব, আমাদের ideology is the correct ideology. আমরা যখন জ্যোতিবাবুর কথা ভাবি আর আজকাল যা আমরা দেখছি, একটা বড় তফাৎ দেখতে পাই। তফাৎটা হচ্ছে যে সেই সময় জ্যোতিবাবু একটা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন। জ্যোতিবাবুর সময় যে কোনো bright young man, a sensitive young man নিশ্চিত Left-এর দিকে আসত, Communist Party-তে Join করতে, অন্তত praiser হয়ে থাকত। সেটা আজকাল আমরা দেখি না। তার মানে নয় যে আসছে না। কিন্তু যে পরিমাণে আসা উচিত সে পরিমাণে আসছে না।

একথা সুনিশ্চিত যে অনেক young bright sensitive ছেলেমেয়ে, ওরা Marxism-এ আকৃষ্ট, কিন্তু Marxism-এর দিকে আকৃষ্ট হলে যে Communist হতে হবে, Communist sympathizer হতে হবে, member-activist না হলেও সেই confidenceটা, সেই belief টা এতটা দেখা যায় না। তার একটা main কারণ হচ্ছে যে, যখন জ্যোতিবাবু communist party-তে এসেছিলেন, তখন পুঁজিবাদ সারা পৃথিবীতে যে মানবসমাজকে একটা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা সবাইকে নাড়া দিচ্ছে বলে দেখা যেত। যুদ্ধ হচ্ছে, 1st World War, Great Depression, 2nd World War মানে যেটা Rosa Luxemburg একেবারে বলেছেন, "the choice is between socialism and barbarism"। এই choiceটা সবাইকে, অন্তত sensitive যারা, যারা শিক্ষিত sensitive ছেলেমেয়ে, এদেরকে এদিকে আসতে দেখা যেত। সেটা আজকাল দেখা যায় না। অনেকে ভাবে যে capitalism চলছে তো চলবেই, capitalism যে আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা তো দেখা যাচ্ছে না, তাহলে এত বিচলিত হয়ে communist party join করা বা communist party-র দিকে যাওয়া, সেটা কি দরকার?

আমি কিন্তু বলব, যে পুঁজিবাদ এখনও মানব সমাজকে একটা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার characteristics, তার রূপ আলাদা। জ্যোতিবাবুর সময় যেরকম ছিল সেরকম না। একটা আলাদা ভাবে মানব সমাজকে একটা crisis-এর দিকে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি এইটা একটু বলতে চাই। ভারতবর্ষের কিছু statistics নিয়ে শুরু করি। আপনি যখন দেখবেন যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, 1990-এর আশেপাশে, যেটাকে British India বলে, British India তে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের absorption ছিল ২০০ কিলোগ্রাম per year. সেটা কমে কমে স্বাধীনতার সময় 1946-47-এ 136 kilogram হল। হয়তো ভাববেন যে 1946-1947 যে একটা বছরে আমরা কি করে বলব? তো আমি পাঁচ বছরের average নিয়ে দেখি যে 1939 থেকে 1944 পর্যন্ত, ওটা কমে কমে 148 kilogram হয়েছিল। দু'শ থেকে দেড়শোর নিচে। মানে, 25% drop। 25% drop যদি মাথাপিছু খাদ্যশস্য absorption-এ হয়, তার মানে মানুষের ক্ষুধা বাড়ছে, hunger বাড়ছে, mal nutrition বাড়ছে। প্রচুর জোরে বাড়ছে। ওই যে পঞ্চাশ বছরে। সেই বৃদ্ধির ultimate result was the Bengal Famine. এখানে আপনারা জানেন যে ত্রিশ লাখ লোক, চল্লিশ লাখ লোক মারা গেছিলেন 1943 Bengal Famine-এ। কিন্তু এই মারা যাওয়ার আগে malnutrition বেড়েছিল, ওদের শারীরিক দুর্বলতা বেড়েছিল, তার মানে যে there was a real crisis. তার পর, স্বাধীনতার পর, ওটাকে খুব চেষ্টা করে বাড়িয়ে, new independent government by end of 1980 প্রায় ১৮০ পর্যন্ত নিয়ে গেছিল। ২০০ থেকে ১৪৮, সেখান থেকে ১৮০। তারপর এই যে periodটা globalization period, neo liberal economic policy's period-এ আবার কমেছে। কমে এখন about ১৬১ কিলোগ্রাম per year। তার মানে এই period-এ যখন আমরা বলছি খুব growth হয়েছে, আমরা বলছি খুব উন্নয়ন হয়েছে, ঐ সময় সাধারণ মানুষের ক্ষুধা বেড়েছে, hunger বেড়েছে, mal nutrition বেড়েছে, শারীরিক দুর্বলতা বেড়েছে। সারা পৃথিবীতে যদি আপনি দেখেন, যখন income বাড়ে লোকেদের absorption of food grains বাড়ে। directly না, এটা না কি আমার বেশি income হলে আমি বেশি ভাত খাই, তা নয়, কিন্তু indirect absorption-meat, poultry এসব দিকেও তো grain গুলো যায়। After all America-য় direct consumption বেশি না। কিন্তু আপনি দেখবেন, প্রত্যেক বছর 900 kilograms হচ্ছে American population-এর মাথাপিছু food grain absorption। আমাদের এখানে ১৬১, কমেছে। সুতরাং যে সময় বেশি growth হয়েছে, আমরা বলছি খুব উন্নয়ন হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে সাধারণ লোকেদের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। যার ফলে ওদের ক্ষুধা বেড়েছে, ওদের hunger, malnutrition বেড়েছে। কেন এটা হল? যদি এত growth হচ্ছে, তাহলে কেন দিন দিন এত ক্ষুধা বাড়বে, কেন লোকেদের অবস্থা খারাপ হবে।

তার কারণ, এই যে growth হচ্ছে, যেটাকে Marx বলেছিলেন primitive accumulation of capital. Petty producers, ছোটোখাটো producer ওদের destruction is part of primitive accumulation of capital. আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, একটা মল হল, ওই যে দোকানদার কোণায় বসে বিক্রী করছিল, ওর business তো গেল। This is an example। Marx বলেছিলেন primitive accumulation of capital. মলের মালিক একজন capitalist. কোণায় বসে যে দোকানী বিক্রী করত, সে একজন petty seller, ও বিপন্ন হল। আমি কেরালাতে অনেক বছর ছিলাম planning board-এ। Diesel price বাড়ল। কেন? আম্বানীরা দাবি করল diesel price বাড়াও। সরকার diesel price বাড়ালেন। কিন্তু কেরালার ঐ যে মৎসজীবী, যে সমুদ্রতে যায় diesel boat নিয়ে, ওর input cost তো বাড়ল, কিন্তু ওর মাছের দাম তো বাড়েনি। তার মানে ওর incomeটা কম হল। ওর income কম হল কিন্তু আম্বানীর income বাড়ল। এটাও primitive accumulation of capital। এই যে এখন Land Acquisition চলছে, গত কয়েকদিন আগে যে Ordinance জারী করা হয়েছে, তার মানে অনেকগুলো projects-এ including P.P.P. projects infrastructure. Infrastructure মানে যা খুশি, infrastructure বলে আপনি যা খুশি চালিয়ে দিতে পারেন। তার মানে যে কোনো project-এ এখন সরকার জমিটা নিয়ে যেতে পারে, from the peasants, from the farmers. Another example of primitive accumulation of capital। তাছাড়া আপনি তো জানেন যে input costগুলো বেড়েছে, credit cost বেড়েছে চাষিদের, কারণ Nationalised Banks যারা আগে loan দিত আজকাল বেশি loan দেয় না। ICICI bank তো বলেই দিয়েছে যে ওরা গ্রামে যাবে না। আমরা middleman use করব। যেটাকে facilitator বলা হয়। Facilitator মানে একটা Money lender, Money lender bank থেকে ১৪%, ১২% interest-এ loan নেবে আর ২০%, ২৫% interest-এ চাষিদের দেবে। তার মানে basically input cost বাড়ছে, outputটা বাড়ছে না। এটাও primitive accumulation of capital। সুতরাং অনেকগুলো এই যে petty production sector, traditional petty production sector, সেটা unviable হয়ে যাচ্ছে, সেটা আর চলতে পারছে না। ওদের থেকে অনেক লোক শহরের দিকে আসছে। যেরকম কোথাও শহরে কিছু চাকরি হতে পারে। কিন্তু শহরে তো চাকরি নেই। সুতরাং এই যে একটা situation, যে income কমে যাচ্ছে, ওরা খেতে পারছে না। ওদের খাদ্য absorption কমে যাচ্ছে, এটাও primitive accumulation-এর আরেকটা রূপ। Education, health তো privatized হয়ে যাচ্ছে। আগে সফদরজং হাসপাতালে ভীড় হত। এখনও হয়। ভীড় হত কারণ ওখানে খুব কম টাকায় খুব ভালো চিকিৎসা হত। আজকাল এখনও ভীড় হয় কারণ ওদের কোনো extension কোথাও হয়নি, সরকার কোনো টাকা খরচ করেনি, on health facilities, on public hospitals। So, what they do now is that everybody আজ কোথায় Appollo যেতে হবে, কোথায় Max-এ যেতে হবে, যেখানে গেলেই হাজারটা test করতে হবে, আর আপনি যদি headache, শুধু একটা মাথাব্যথা নিয়ে যান তাতেই ওখানে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা বিল হয়ে যাবে। ধরুন আমার বাবা বা আমার ছেলের মাথা ব্যথা হচ্ছে, মাথায় কোনো একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, তো আমি কি বলব, যে না বাবা আমি তোমায় Max বা Apollo-তে নিয়ে যেতে পারব না, আমার কাছে অত টাকা নেই। ঐ সময় emergency-তে আমি ওকে নেব। তারপর আমি জমি বিক্রি করে, বাড়ি বিক্রি করে যেভাবেই হোক ওই বিলটা মেটাব। কিন্তু expenses on health and education has gone up আর সে কারণে খাদ্যে expense অনেকটা কমেছে। If you cannot afford it so it is the other reason. সুতরাং এই যে growth path আমরা দেখছি, এই যে নয়া পদ্ধতি আমরা দেখছি, এই উন্নয়নের পদ্ধতি একটা বড় অংশ হচ্ছে, impoverishment of petty producers, of agricultural labourers, of industrial workers। কারণ অনেক লোক এসে যদি শহরে চাকরির জন্য চেষ্টা করছে, তাহলে Marx যেটাকে বললেন, reserve army of labour মানে unemployed, underemployed-এর সংখ্যা বাড়ছে। ওদের সংখ্যা যদি বাড়ছে, তাহলে আপনারা জানেন যে Trade Union Movement-এ, আপনাদের নিজের experience আছে যে ওদের সংখ্যা যদি বাড়ছে, তাহলে Trade Union-এর শক্তি কমে যায়। ওদের Union strength কমে যায়। আর real wages ও বাড়েনা। Real wages বরং কমে। Industrial workers, even organized workers, unorganized workers, petty producers, and if petty producers-এর crisis হচ্ছে তো agricultural imbalance and crisis হবে। এর মাধ্যমে একটা বিরাট বড় class of working people has been evicted of this growth strategy.

কিন্তু এই সময়ে মধ্যবিত্তরা, middle class, upper middle class, professional, urban educated ওদের খানিকটা উন্নতি হয়েছে। ওদের জন্য এই যে outsourcing, অনেকগুলো IT related services হয়েছে, অনেকগুলো white collared jobs বেড়েছে। সুতরাং ওদের অনেকটা উন্নতি হয়েছে। যদি wages বাড়ছে না কিন্তু যদি খুব জোরে GDP i.e. Gross Deomestic Product বাড়ছে, ৬%, ৭%, ৮%, তাহলে surplus তো বাড়বে। ধনী লোক তো বেশি ধনী হবেই। এটা হয়েছেও। কারণ বর্তমান list of billionaires-এ এখন অনেক ভারতীয়ের নাম পাওয়া যায়। ওরা যদি ধনী হয়, তাহলে ওদের জন্য five star hotel চাই, ওদের জন্য airport চাই, ওদের জন্য অনেক কিছু service চাই, আর ওই services এর সঙ্গে অনেক professional লোক যে জড়িত। So you find অনেক middle class employment facility বেড়েছে। সুতরাং এই যে periodটা যেখানে neo-liberal policies লাগু হয়েছে যেখানে working people, ordinary working people-এর ক্ষুধা বেড়েছে, hunger বেড়েছে, mal nutrition বেড়েছে, সেখানে middle class-দের অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে একটা situation এসেছে যেখানে growth আর হচ্ছে না। আপনি দেখেছেন যে industrial growth rate now is zero. গত দু'বছরে ভারতবর্ষে industrial sector একেবারে বাড়েনি। একটু কমেছে বরং বাড়েনি। Industrial output is stagnant. GDP growth rate কমে কমে যাচ্ছে। কেন কমছে? তারও একটা কারণ আছে। এই যে globalization এর period-এই যে neo-liberal policies-এর period-এ investment কেন হয়, growth কেন হয়? Growth হয় credit bubbles থেকে। Bankগুলো অনেক Credit দিল। Bank যদি credit দেয়, খরচা হয়। খরচা হয়, তো demand বাড়ে, demand বাড়ে তাহলে growth হয়। Output-ও বাড়ে। Bank credit থেকে আপনার property price boom যেটাকে bubble বলে Asset price যেটা আমেরিকায় হয়েছিল in the housing market যেরকম ভারতবর্ষে হয়েছিল in the stock market, asset price-এর bubble হয়, asset গুলোর দাম বেড়ে যায়। ধরুন আমার কাছে একটা জমি আছে, যদি জমির দাম বেড়ে যায়, যে জমির দাম দশ হাজার ছিল তার দাম হঠাৎ করে দশ কোটি টাকা হয়ে গেল তখন আমি তো বলব যে আমি তো ধনী। আমি তখন আরো খরচ করব। আমি আরো খরচা করলে demand আরো বাড়বে। Demand বাড়লে আরো output বাড়বে। Output বাড়লে growth বাড়বে। সুতরাং neo-liberal economy growth resource হচ্ছে credit sustained bubbles. Expenditure versus price bubbles. কিন্তু এই bubblesগুলো যেমন হয়, তেমনি ফেটেও যায়। যেরকম আমেরিকাতে হল। আর এরা যখন ফেটে যায়, তার effect সোজা কথা নয়। তাই জন্যে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে একটা bubble burst হওয়ার পর crisis চলছে। ২০০৮ সালে আমেরিকায় যে housing price bubble burst করেছিল, এই ২০১৪-তেও, world economy has not recovered। আমেরিকায় একটুখানি উন্নতি হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে oil-price একটু কমেছে। যখন bubble burst করে neo-liberal economy তে অনেক বছর এরকম stagnation period চলতে থাকবে। আমাদের এখানে সারা পৃথিবীতে economy-র bubble burst করার effect আমাদের রপ্তানির ওপর পড়েছে। আমাদের domestic price bubble আর আমাদের property prices are not going up any more. সুতরাং আমাদের দেশেও একটা stagnation এসে গেছে।

যদি stagnation হয় তাহলে এই যে মধ্যবিত্ত যার থেকে প্রচুর support আসত, for neo liberal policy তারা কি করে support দেবে। ওরা যদি support করা বন্ধ করে দেয়, আর গরিবরা তো এমনিতেই getting squeeze by the new liberal policy। তাহলে এই policy চলবে কী করে? সেই সময় neo-liberal policy-র পেছনে যারা আছেন, যাকে আমরা বলি globalised finance, globalised capital যা আজ সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, international finance capital আর ওদের সঙ্গে আমাদের যে corporate financial oligarchy জড়িত আছে। এরাও বাইরে invest করছে। এরাও আমেরিকা, ইউরোপে invest করছে। এরাও সারা পৃথিবীতে involved, এরাও list of billionaries-এ আছে। আমাদের corporate financial oligrachy and behind it international finance capital supported by the U.S. and the imperialist countries খুব নতুন ধরনের একটা strategy করে। এই Strategyটা কী? এই যে crisis হচ্ছে এই crisisটা আপনি বলবেন neo-liberalism-এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কেন crisis হচ্ছে, না মনমোহন সিং decision নিতে পারত না। কেন হচ্ছে? না খুব corruption. কিন্তু crisisটা যে neo-liberal policy-র সাথে জড়িত সেটা অদৃশ্য করাই এদের main চেষ্টা। We need a strong decision maker, কেন problem কিসের? Manmohan Singh won't take good decision. So we need a strong man Modi. সুতরাং এই যে crisis-এর কারণ neo-liberalism নয়, কারণ হচ্ছে we had a weak leader, now we have a new leader, এখন খুব ভালো চলবে। বললেই তো হবে না, corporate-দের টাকা চাই leaderকে push করতে, তা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

প্রচুর সংখ্যায় পাওয়াও গেছে। আপনারা জানেন যে আমেরিকায় ওবামার presidential election-এ যা expenditure ছিল তার চেয়ে মোদীর expenditure বেশি ছিল। অনেক খবরের কাগজে তা বেরিয়েছে।

Corporate finance-এর সাথে একটা mass movement তো চাই। যে mass movementটা চাই তা হল communalism. তাই হিন্দু মুসলমান শুরু করো। একটা majority-minority শুরু কর। উত্তরপ্রদেশ যেখানে NDA swept the polls, সেখানে election-এর আগে দাঙ্গা হয়েছিল। যেখানে election হচ্ছে সেখানেই তার আগে দাঙ্গা হচ্ছে। দিল্লীতে, ত্রিলোকপুরীতে দাঙ্গা হয়েছে। তো একটা communal polarization যেটা কি লোকের মনে একটা mass factor তৈরি করবে alongwith corporate finance you can have a new government। Palmiro Togliatti খুব বিখ্যাত একজন ইতালীয় communist leader। In 1930's he was the General Secretary of the Communist International যখন দিমিত্রভ ছিলেন president. তিনি তাঁর একটা বই ''Lectures on Fascism''-এ লিখেছেন যে fascism has a class character and a mass character. Class chracter হচ্ছে যে corporate-দের support করা হয়, pro-corporate policies কীভাবে হয় সেটা দেখা, কিন্তু শুধু ওটা দিয়ে হয় না। একটা mass character চাই। এই mass character হচ্ছে communal polarization. আমি বলছি না যে ভারতবর্ষ একটা fascist state. যদি fascist state হত তাহলে আমি আপনাদের সামনে এই কথাগুলো বলতে পারতাম না। কিন্তু fascist elements are now in positions of the operative government. সেটা হচ্ছে একটা corporate communal alliance. এই allianceটা সোজা ব্যাপার না। এতে অনেক tension আছে। আপনারা তো দেখছেন যে recently re-conversion করব, 'ঘর ওয়াপসি' বলাতে রাজ্য সভা বন্ধ আর রাজ্য সভা বন্ধ হলে corporate-দের interest আছে বেশ কিছু বিল has to be passed. সুতরাং যাও, অর্ডিন্যান্স কর। অর্ডিন্যান্স ছ'মাস বাদে lapse হবে, তাই ওরা বলছে যে তোমাদের এই communal element গুলোকে একটু control করো। কারণ corporates-রা টাকা দিয়েছে, corporate রা চায় যে এই সরকার আসুক। আর যেহেতু এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে তো corporates-রা চায় যে এই সরকার labour rights flexible করুক। মানে right to complete hire and fire হোক। Corporates চায় যে land acquisition should become easy. Corporates চায় যে multinational companies should be allowed. Corporates চায় যে nationalized banks must be privatised. Rather Americans চায় যে nationalized banks should be privatized. এই যে ওদের agenda আছে, সেই agenda-কে push করার জন্য it is important that parliament must function. Congress ও a part of this agenda. কারণ এরাই তো এসব neo liberal policies শুরু করেছিল। সুতরাং এদের idea হচ্ছে লোকসভাতে এদের majority আছে। রাজ্য সভাতে Congress support আছে। সুতরাং তুমি এই communal element গুলোদের একটু control করে রাখ, তাহলে রাজ্যসভাও চলবে। তো এই corporate-communal alliance-এ একটু tension থাকবে। Tension আছে, tension দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই tension যে alliance-কে break করবে তা নয়। এটা হচ্ছে, এরা একটু manage করবে, ওরা একটু control করবে। এটাই হচ্ছে basically corporate-communal alliance.

এই যে corporate-communal alliance, এরা আমাদের দেশে as I said, fascist forces are getting prepositions of authority. শুধু আমাদের দেশেই না, সারা পৃথিবীতে আজ একটা fascism বাড়ছে। এটা exactly 1930s এর fascism নয়। এটা একটা নতুন ধরনের fascism. For instance, আপনারা জানেন, ইউক্রেনে, যেটা নিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে confrontation হয়েছে, 1st time in post World War Europe a fascist party who supported Hitler are now having ministers in the Ukraine government. আজকের খবরের কাগজে একটা লেখা আছে, যে in Germany there is a group that is formed which is anti-Islamic. যদিও the government in Germany is going to say or ask and appeal to people যে এদের সঙ্গে কোন relationship রেখো না। তবুও opinion polls বলে যে, one out of every six Germans does belong to some kind of anti-Islamic group. কেন? না সারা ইউরোপে ভীষণ economic crisis. ভীষণ unemployment চলছে। যখন এইরকম economic crisis চলে, unemployment চলে তখন it becomes easy to tell people যে দেখ, এই যে crisis চলছে, এর কারণ হচ্ছে ঐ দেশের লোকগুলো এই দেশে পালিয়ে এসেছে। ওই মুসলমানগুলো আমাদের দেশে পালিয়ে এসেছে। ঐ minorityগুলো ঐ gypsyগুলো এদেশে পালিয়ে এসেছে। ঐ কালো লোকগুলো আমাদের দেশে চলে এসেছে, etc etc. **Situations of crisis, situations of unemployment are ideal for splitting people.** আর ফ্যাসিজম-এর role হচ্ছে মানুষকে split করা। Majority-minority; majority-authoritarianism; যা কিনা mobilise করা হচ্ছে for corporate interest. আমাদের দেশেও একই করা হচ্ছে। যখন এটা হচ্ছে, তা হলে এর কি implications.

প্রথম implication হচ্ছে— this is an anti-democratic situation. Minorities are insecure. That is a fundamental assault on the democracy. Democracy মানে হচ্ছে যে, whatever be my religion, whatever আমি ওড়িশা থেকে আসি, না আমি আসাম থেকে আসি, বা মণিপুর থেকে আসি, wherever I come from, I am the citizen of the country, I enjoy equal rights. যদি democracy এটা না দিতে পারে, this is an assault on democracy. এটা তো সোজাসুজি ব্যাপার।

Secondly, এই যে assault on democracy হচ্ছে, যা কিনা against religious minority, against the Muslims in the name of 'Ghar Wapsi', এটা শুধু against Muslims নয়, এটা also against the lower caste, against the agricultural labourers, against Dalits. আপনি দেখেছেন, যে recently there is a big move যে Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemeটি তুলে দাও। কেন? 34 thousand crores is the budget for it. এটা খুবই কম। ভারতে GDP is একশ কুড়ি লাখ কোটি টাকা। একশ কুড়ি লাখ কোটি থেকে 34 lakhs is 0.3%. MGNREGA তে এটা খরচা হয়।

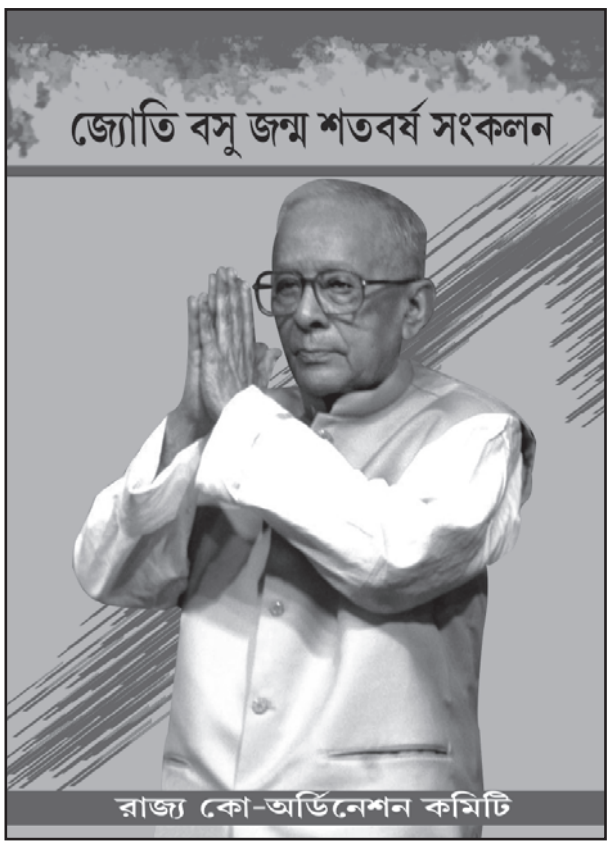

কিন্তু সবাই বলছে crisis is because of that. তুলে দাও। যদি তুলে দেয়, তাহলে কে suffer করবে? Agricultural labourers. Already ওদের condition খুব খারাপ। আর আমি যে বলছিলাম যে agricultural labourers দের মধ্যে main sections are Dalits. এই যে Land Ordiannce, Forest Right Acts. এগুলো যদি আরো তুলে দেওয়া হয়, তাহলে, মানে যা restrictions ছিল তা তুলে দেওয়া হয়, tribal population is only going to suffer. তাই এটা শুধু anti religious minority নয়। This is against entire segment of Dalits, agricultural labourers and lower castes, tribal people. It's the oppressed people at large.

ভারতবর্ষে গত বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে there has been a bit change. কেরালার কথা বলছি। এখানেও তাই হবে। কেরালাতে, at the beginning of twentieth century, there was not only untouchability, শুধু অস্পৃশ্যতাই না, there was unseeability. Uuseeability, মানে যদি কোন উচ্চ জাতির লোক, upper caste, Nair or Namboodri যাচ্ছে, একটা carriage অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়িতে যাচ্ছে, সেই রাস্তায় যদি কোন দলিত যাচ্ছে, তা দলিতের গলায় একটা বেল লাগানো থাকত। যেটার আওয়াজ হত। তার আওয়াজ শুনে ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান বলত, তুমি লুকিয়ে পড়, just hide। দলিত তারপর রাস্তার কোন ধারে লুকিয়ে বসত, and the coach would come out. Unseeably, যেখানে এইরকমের oppressive atmosphere ছিল, সেখানে কেরালাতে communist government one of the best social indicators recorded an enormous change. এই changeটা শুধু কেরালাতে যে হয়েছে তা নয়, সারা ভারতবর্ষে অনেক বদলে গেছে। One man one vote, one person one vote. আমি গ্রাম থেকে এসেছি। ওড়িশার একটা গ্রাম থেকে আমি আসি। যখন one person one vote হল, in 1950 elections, আমি নিজের চোখে দেখেছি, গ্রামের যে land lord কত রেগে গেল এই দলিতদের ওপর। সে নিজের ভোট নিজে দিচ্ছে। He is saying this vote is mine! This was a big social revolution.

Indian-দের গত একশ' বছরে there has been a great social revolution. যদিও এই revolution has not been as much as you would like. তবুও অনেক change হয়েছে। আমার মতে এখন যা হচ্ছে, it is actually a counter revolution. একটা social counter revolution-এর দিকে আমরা অগ্রগতি করছি। কিন্তু যদি একটা social counter revolution হয়, লোকেরা চুপ করে বসে counter revolution সহ্য করবে না। তার মানে হল, social disintegration হবে। There will be lot of violence. যদি আপনি এইসব করবেন, I mean ধরুন NDA, এদের বিভিন্ন ধরনের outfits, মুসলমান দেখলে এরা বেশি oppress করবে, তাহলে তালিবান এখানে আসবে, and there will be social disintegration. So, social disintegration is now the form. অর্থাৎ পুঁজিবাদের যে এখনকার crisis, সেটা পরিষ্কার, এইরকম একটা social counter revolution and a social disintegration শুরু হয়ে গেছে। সব দেশগুলোকে push করা হয়েছে পুঁজিবাদের আরো আধুনিক যুগের crisis-এ। আগে যেমন লেনিনের সময় ছিল যুদ্ধ, between different groups, between different countries, এখন যুদ্ধ না, এখন there is a universal push of mankind towards a social disintegration inside their country. এই social disintegration থেকে বাঁচাতে হলে, working class would have to take the lead.

সুতরাং, আজকের topic হচ্ছে present situation of working class and the task of the working class. Working class এর main task হচ্ছে, দেশকে বাঁচাতে হবে, এই যে দেশকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে social disintegration-এর দিকে, এর থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। তার মানে কী? প্রথম কথা হচ্ছে, we have to defend democracy. Defending democracy is absolutely essential. কারণ আমি বললাম, যে ভারতবর্ষে achievement of democracy came in 1952 through democratic elections. তার আগের constitution universal suffrage guarantee করেছিল। আর ফ্রান্সে universal suffrage came in 1945. তার মানে ভারতবর্ষে যখন universal suffrage এল, যখন ফ্রান্সে universal suffrage এল খুব একটা তফাৎ ছিল না। সুতরাং আমাদের দেশে যে guarantee of universal suffrage, এই ব্যবস্থাটার roll back করা, we have to prevent it. Working class has the role in defending democracy. In defending the social revolution and carrying forward the social revolution. কিন্তু working class also, globalisation-এর প্রথম impact তো হচ্ছে যে, আমি বললাম যে crisis, globalisation-এর impact ও working class-এর ওপর পড়ে যায়। কেন? চারটে কারণ আছে যে কারণে globalisation এর impact working class-এর ওপর পড়ে।

প্রথম কারণ হচ্ছে primitive accumulation of capital. এই যে ভারতবর্ষে গ্রাম থেকে লাখ লাখ সংখ্যায় কৃষকদের সংখ্যা, peasants দের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ওরা শহরে আসছে। শহরে কিন্তু, they crowd, they join the reserve army of labourers. দুটো implication. প্রথম হচ্ছে, unemployment, underemployment বাড়ে। যার কারণে the working class gets weakened. আর ঐ যে casual employment, casualisation of work, permanent না হয়ে হয় casualisation of work. Casualisation হলে trade union movement করা মুশকিল। দিল্লীর বাইরে একটা মারুতি কোম্পানি আছে। মারুতি ফ্যাক্টরিতে আমি শুনেছি, আমি ওদের থেকেই শুনেছি, যে তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। এখন the workers in this automobile factory are casual workers. They are not permanent workers. যদি কোনো লোককে দেখা যায় কি কোন hand bill দিচ্ছে, আর সেটা যদি কোনো গার্ডের চোখে পড়ে, next day the worker is sacked. আপনি কি ট্রেড ইউনিয়ন করবেন। তো প্রথম কথা হচ্ছে casualisation.

দ্বিতীয়ত যে যখন এই reserve armyটা বাড়ে, তখন একটা লুম্পেন প্রলেতারিয়েতও বাড়ে। কাজ নেই, চাকরি নেই তো কিছু anti-socialও বাড়ে। আমার মতে, আপনারাও বুঝতে পারবেন, specially in the current formation in West Bengal which is ruling party has a substantial support from the loompen proletariat. Crime against women, যেটা সব জায়গায় বাড়ছে, that is part of the loompenisation of our social life. Loompen proletariat বাড়ে। And that also weakens the working class. মানে প্রলেতারিয়েত বাড়ে না, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত বাড়ে। Casual workers বাড়ে। সুতরাং প্রলেতারিয়েত movement দুর্বল হয়ে যায়। The third is privatisation. সারা পৃথিবীতে আপনারা দেখবেন, public sector workers বেশি unionised হয় than private sector workers. In America, public sector workers including teachers, 33% of public sector workers are unionised. Private sector workers দের মধ্যে ৮% unionised. তার মানে public sector workers are far more unionised than private sector workers. ফ্রান্সে, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন movement এখনও আছে, তথ্য বলছে, যে ফ্রান্সে, বর্তমানে public sector is still a very important element of French economy. যদি privatisation হয়, তাহলে privatisation-এর একটা feature হচ্ছে, weakening of trade union movement.

Finally, একটা কারণ হচ্ছে যে commoditisation খুব বেড়েছে। এটা তো capitalism-এর লক্ষণ। Education-এ commoditisation এসেছে। আমি চল্লিশ বছর ধরে যেখানে পড়াচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি যে এরকম একটা change হচ্ছে। J.N.U. তবু একটা exception হতে পারে। কিন্তু যে জায়গায় interest in politics, interest in other human beings, interest in other people's lives, all these are away. আর ওদের কোনো দোষ দিয়ে লাভ নেই। যদি আমার বাবা loan নিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে আমায় educate করিয়েছে, তাহলে আমার কর্তব্য হচ্ছে কোথাও একটা ভাল চাকরি নিয়ে যেখানে ভাল টাকা পাব, আমি ঐ loanটা ফেরত দেব, নাহলে আমার বাবার ওপর চাপ আসবে। সুতরাং education যখন commoditised হয়ে যায়, যাদের ওপর education দেওয়া হচ্ছে, তারাও commoditised. So you have this enormous commoditisation. যেরকম জ্যোতিবাবু সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে এসে, সাধারণ মানুষের জন্য সারা জীবন ভেবে গেলেন সেরকম আজকাল পাওয়া ভীষণ কঠিন হয়ে যায়। আমি বলছি না সেরকম নেই, কিন্তু কঠিন হয়ে যায়। So

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

মহিলা অধিবেশন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

কাছে এক বিপদ হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

সি আই টি ইউ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে একত্রিত করতে চাইছে। ২ দিনের ধর্মঘটের পরে প্রধানমন্ত্রী নিজে ধর্মঘটের দাবীগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন এবং একটি কমিটি তৈরী করেছিলেন।

শ্রমজীবী মানুষকে বুঝতে হবে কোন নীতিগুলি তারপক্ষে ভালো এবং কোন নীতিগুলি তার পক্ষে ক্ষতিকারক— এই বলে কে. হেমলতা তার বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুরু হয়। এখানে ৩০ জন মহিলা প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। প্রথমেই প্রতিবেদন পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুতপা হাজরা। তিনি হিন্দিতে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্তমানে মহিলা সমাজ কিভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পারিবারিকভাবে শোষিত এবং অত্যাচারিত হচ্ছে, তা তুলে ধরেন। তিনি মহিলা সংরক্ষণ বিল যার মধ্য দিয়ে ৩৩.৩৩% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার কথা তাকে লোকসভায় পাশ করানোর ক্ষেত্রে যে বাধা দেওয়া হয় তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

বিহারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে উঠে নীলম কুমারী বলেন যে কামানে ওয়ালা খায়েগা, লুটনে ওয়ালা জায়েগা। ছত্তিশগড়ের মীনা সাহু দাবি তোলেন যে নাসবন্দী (বন্ধ্যাত্বকরণ) কান্ডে যারা জড়িয়ে রয়েছেন তাদের শাস্তি দিতে হবে। গোয়ার পক্ষে স্নেহা মান্ডেকার বলেন যে গোয়াতে নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদ প্রায় নেই বললেই চলে। গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা সেখানে প্রায় নেই বললেই চলে। বিবাহ সর্বদাই নিবন্ধীভুক্ত হয়। আবার প্রায় এর বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠে হরিয়ানার মুকেশ যাদবের বক্তব্যে। তিনি বলেন যে হরিয়ানায় ব্যাপকভাবে কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয়। কিছু গ্রাম আছে সেখানে ১০০০ পুরুষে ও ২৮০ জন মহিলা আছে। কেরালার পক্ষে শীলা কুমারী বলেন যে কালা জাদুর মতো কার্যকলাপ কেরালায় প্রচলিত আছে যার কুফল ভোগ করে মূলত মহিলারা। মহারাষ্ট্রের পল্লবী বলেন যে পরিবার থেকেই লিঙ্গভেদের সমস্যা শুরু হয়। ত্রিপুরায় রত্না সরকার বলেন যে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমরেড শিখা মুখার্জী বলেন যে বাংলায় কখনও ডাইন প্রথা চালু ছিল না, কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পরে এরকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে।

মোট ৩১জন প্রতিনিধির আলোচনা গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন হরিয়ানার সবিতা। ৩.৩০ মিনিট নাগাদ মহিলা অধিবেশন শেষ হয়।□ *প্রণব কর*

জ্যোতি বসু জন্মশতবর্ষ সংকলন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ

শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

this commoditisation is leaving another impact. Marx বলেছিলেন, communist Manifesto-তে যেটা লেনিনও পরে বলেছিলেন যে ideas of understanding history প্রথমে শিক্ষিত লোকদের হয়, because they have the privilege of education. ওদের মধ্যে, when they carry this ideology to the working class. কিন্তু যদি শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কেউ না থাকে, who can carry this ideology to the working class তাহলে this ideology of change, ideology of revolution শ্রমিকদের কাছে পৌঁছায় না। এই বিভিন্ন কারণে শ্রমিক movement, শ্রমিক আন্দোলন, trade union movement অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে during the era of globalisation. তার মানে এই নয় যে কিছু হবে না। তার মানে এই যে এখন আমরা আরো কঠিন পরিস্থিতির ভেতরে আমাদের আবার গড়ে তুলতে হবে। A challenge to the process of globalisation. এখানে বাম শক্তিদের একটা মুখ্য ভূমিকা একটা প্রধান ভূমিকা আছে। কিন্তু আমরা কি করতে পারি? অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু আমি শুধু একটা কথা বলে শেষ করব।

প্রথম কথা হচ্ছে, যে আপনারা দেখবেন যে যখন congress led UPA government-এর বিরুদ্ধে, এই যেমন MGNREGA-র ওপর attack হল, এই UPA-2 government-এর বিরুদ্ধে একটা main allegation ছিল এরা transverse, এরা গরিবদের জন্য টাকা দিচ্ছে, ওটা ওদের খুশি করার জন্য, to appease them, ভোট নেওয়ার জন্য তারা টাকা দিচ্ছে। আর এই last parliament election-এ একটা middle class versus lower class একটা contradiction subtly চালানো হয়েছে as if NREGA ওটা ওদের জন্য। Peasants দের বলা হল, যে দেখ, এতে তো wage বাড়বে, wage বাড়লে তোমাদের ক্ষতি হবে। এইভাবে একটা middle class versus lower class, Dalit versus intermediate class একটা contradiction বানানোর চেষ্টা হয়েছিল। শ্রমিক movement, left movement আমার মনে হয়, should really guarantee some universal economics rights. Universal, যাকে কেউ বলবে না যে তুমি শুধু ওদের জন্য করছ, আমাদের জন্য কিছু করছ না। There has to be universal economic rights. এই ideaটা নতুন নয়। এই ideaটা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও চালানো হয়েছিল। 1931 করাচি কংগ্রেসে একটা point ছিল we said that every Indian would be assured a minimum material standard of life. সেটা আজ পর্যন্ত হয়নি। যদি working class and the left movement that is committed to the working class ওই জিনিসকে আজ বানানোর চেষ্টা করে, তাহলে it has to guarantee certain universal rights. আমি শুধু পাঁচটি universal rights এর কথা বলব। ওর সাথে আপনারা আরো কিছু যোগ করতে পারেন।

একটা হচ্ছে **Universal right to employment.** এই যে NREGA একটু ওদিকে এসেছিল but now, infact already, যদিও NREGA এখনও বন্ধ হয়নি, সরকার বলেছে না না, আমরা এটা তুলে দেব না, in practice it has got reduced. আমি আপনাদের কতগুলো figures দিতে পারি। 34 thousand crores দিয়েছিল এবছর NREGA-র জন্য। গত বছরও 34 thousand crores-ই ছিল। গত বছর ১০ হাজার কোটি টাকা has not been paid to workers. ওরা কাজ করেছে। কিন্তু ওদের wage দেওয়া হয়নি। যদি ওই স্কেলে আমরা MGNREGA চাই, we need 34 thousand crores plus 10 thousand crores arrear plus 10 thousand crores যেটা গত বছর ওরা কাজ করেছিল, এবছরও করবে। তার মানে 54 thousand crores. কিন্তু শুধু দেওয়া হয়েছে, 34 thousand crores. তার মানে already ওটাকে whittle down করা হয়েছে। So, in India, the universal economic right এই পর্যন্ত হয়নি। So, first is the iniversal right to employment. আর employment না পেলে there has to be a **living unemployment allowance.** Adequate unemployment allowance.

তারপর আছে **Universal right to food.** আপনারা বলবেন যে, এটা তো হয়েছিল UPA 2 আমলে। না UPA2 আমলে যে বিলটা পাশ করল the last government, that is a right to two third of the population. আর সেটাও আর এখন লাগু হচ্ছে না। A universal right to food at affordable prices for everybody.

তৃতীয় হচ্ছে **Universal right to free health care, free quality health care for everybody.** গত কালের খবরের কাগজে তো সরকার বলেছে এই সরকার, মোদী সরকার বলেছে যে আমরা একটা right to health care করব। কিন্তু দেখবেন ওরা যেমন বলছে যে universal right to health care ওরা দেবে তেমনি বলছে, যে expenditure on health care cannot be more than 2.5% of the GDP. তার মানে যে ওরা যে বড় বড় কথা বলছে, যার মানে লোকেদের মধ্যে এই demandটা আছে। নাহলে কেন বলত? কিন্তু ওদিকে ওরা বলছে যে ২.৫% এর বেশি আমরা দেব না। সুতরাং কথা হচ্ছে this you have to ensure. Capitalist countries-এ আছে, England-এ আছে, Scandinavian countries-এ আছে National Health Service. এই দেশে it is a shame যে after almost seventy years of independence health care is so expensive.

চতুর্থ হচ্ছে, **a universal right to quality education.** আপনি বলবেন হয়েছে তো। কিছুই হয়নি। Quality education হচ্ছে, series of neighbourhood schools which have quality and which are run by the state. সেটা আমাদের দেশে হয়নি। যে কোনো শহরে even in Kolkata, যে কোনো traffic light-এ আপনি দেখবেন যে বাচ্চাগুলো এসে ভিক্ষা চাইছে। তো what is the right to education. What is the right to education when children are begging at every street corner? They should be in schools. So, a universal right to education, free, compulsory education as a right. Free and right for every child is compulsory so that there is no begging and nothing. This has to be given as the part of minimum universal rights.

Finally I would say, **Universal right to old age pension and disability pension.** এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, দশ কোটি লোক are senior citizens. They need support. ওদের মধ্যে অনেকাংশ either depending on families or are in a miserable condition.

এই যে minimum অতগুলো rights, এইগুলো আপনি যদি দেখেন, দেখবেন, they would not costs more than about 10% of the GDP. ধরুন পুরো 10% of GDP tax থেকে finance করা হবে, এখন tax : GDP ratio যদি India তে ১৪%, state-central মিলিয়ে এখন ১৪% দিলে ওই ১৪টা ২৪ হয়ে যাবে। আমেরিকায় tax : GDP ratio, capitalist country, leading capitalist country সেখানে tax : GDP ratio 24%. তার মানে আমরা যদি এইসব করি তাহলে our tax : GDP ratio will come to the same level. আমি কোনো বিপ্লবের কথা বলছি না, আমি শুধু বলছি, এই tax : GDP ratio বাড়িয়ে এই কতগুলো minimum করো। যদি আমরা এই minimum demand গুলো করি, সরকার তো করবে না। কিন্তু এই minimumগুলো, লেনিন যেটা বলেছিলেন, transitional demand হিসাবে কাজ করবে। Transitional demand মানে এই minimum demandগুলো নিয়ে লোকেরা mobilized হবে। লোকেদের একটা নতুন উৎসাহ হবে। একটা নতুন আশা হবে। যদিও সেই আশাটাকে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ পূরণ করতে পারবে না। কিন্তু ঐ আশা নিয়ে আমরা লোকেদের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটা নতুন সমাজ গড়ার চেষ্টা করব। এটার জন্য যদি আমরা এই পুঁজিবাদকে push করি, যদি working class এই পুঁজিবাদকে push করে, immediately কি হবে? Immediately দেশ থেকে টাকা বেরোবে। Capital flying যাকে বলে। টাকা চলে যাবে বাইরে। যদি টাকা বাইরে চলে যায়, টাকা আপনারা জানেন যে আজকাল আমরা এমন একটা universe-এ থাকি যে **capital is international, state is a nation state.** আমাদের একটা India government আছে, একটা পাকিস্তান government আছে, একটা বাংলাদেশ government আছে, শ্রীলঙ্কা government আছে, state is a nation state but capital is international. মানে capital state কে বলবে এটা কর, না করলে আমি চলে যাব। সুতরাং, nation state have to listen to capital because capital is international. They cannot think of the people even with the best of intention. ধরুন কাল there is a Left Front government in India. যদি Left Front government দেশকে ঐ globalization থেকে না বের করে তাহলে Left Front governmentও তাই করবে। কারণ যদি আপনি না বের করেন, তাহলে capital চলে যাবে, আর capital চলে গেলে crisis হবে। So this is very important যে আমাদের capital control becomes necessary. Capital control হলে আমেরিকানরা চেঁচাবে। যেমন এখন ওরা রাশিয়ার সাথে করছে। কিছু trade control করবে। So we also have to control trade They put embargo on our exports etc. মোটামুটি এই আলাদা একটা programme যদি আমরা মানুষের সামনে রাখি, আর seriously রাখি তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে we have to de-link from globalization. আমরা চাই না কিন্তু আমরা forced হব to de-link from globalization. কিন্তু এই de-link from globalization is essential. তাই আমরা লোকেদের সামনে একটা নতুন agenda. একটা নতুন প্রোগ্রাম রাখতে চাই, seriously রাখতে চাই, seriously implement করতে চাই। **That is the way forward to socialization.** □

[অনুলিখন ঃ মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী]

খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের ওপর রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক আক্রমণ

রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধে লক্ষ্মণ একবার ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলে ঘায়েল হয়ে মৃত্যুমুখে পড়েন। তখন বিভীষণ পরামর্শ দেন একমাত্র গন্ধমাদন পর্বতে বিশাল্যকরণী গাছের পাতা ওষুধ হিসাবে খেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারেন লক্ষ্মণ। হনুমানের উপর দায়িত্ব পড়ে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে বিশাল্যকরণী গাছ খুঁজে আনতে। হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে যান কিন্তু গাছটি খুঁজে না পেয়ে পুরো গন্ধমাদন পর্বতটি তুলে নিয়ে আসেন। এ ঘটনা সবাই জানেন। খাদ্য দপ্তরের সদ্য প্রকাশিত ১৪৬ জন কর্মচারীর বদলির একটি কালা আদেশনামা দেখে আবার এই ঘটনা মনে পড়েছে। খাদ্য দপ্তরের খড়্গপুরে এবং ঝাড়গ্রাম অফিসের ভৌগোলিক অঞ্চলে কেরোসিন তেল বণ্টন নিয়ে কিছু ভুল ধরা পড়েছে। রেশন কার্ডের থেকে বেশি পরিমানের তেল সেখানকার ব্যবসাদাররা সংগ্রহ করছে খাদ্য দপ্তরের কাছ থেকে। প্রয়োজন ছিল তদন্ত করে এই কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিক, কর্মচারী এবং ঐ কেরোসিন ডিলারদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। কিন্তু প্রশাসকদের অত সময় কোথায়। তারা গন্ধমাদন বয়ে আনলেন। খাদ্য দপ্তরের খড়্গপুর এবং ঝাড়গ্রাম অফিসের প্রতিটি কর্মচারীকে শাস্তি দিয়ে তারা জেলার বাইরে বদলি করলেন।

খড়্গপুর এবং ঝাড়গ্রাম অফিসের ৭৪ জন কর্মচারীকে জেলার বাইরে বদলি করা হল, এবার অফিস দুটি চালাতে বাইরের জেলা থেকে কর্মচারী সেখানে বদলি করে আনা হবে এটাই নিয়ম। সেখানেও গণ্ডগোল। ৭৪ জনকে বদলি করার এই সুযোগ প্রশাসনের ভিতরে থাকা আড়কাঠিরা ছাড়তে পারে? শত হুমকি সত্ত্বেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি করা, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির সদস্য থাকা কর্মচারীদের টাইট দেবার এই সুযোগ প্রশাসনের ভিতরে থাকা আড়কাঠিরা লুফে নিল। বেছে বেছে উক্ত সমিতির সংগঠক, নেতাদের দূরবর্তী জেলা থেকে নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই বদলীর তালিকায় যুক্ত করা হল। খড়্গপুর এবং ঝাড়গ্রাম অফিসে কর্মচারী পাঠাতে সংলগ্নবর্তী জেলা নয় রায়গঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে কর্মচারীকে বদলী করা হল। দোষ করল খড়্গপুর এবং ঝাড়গ্রামের কেরোসিন ডিলার, তার টিকি ছুঁতেও পারল না প্রশাসন কিন্তু শাস্তি পেল রায়গঞ্জের বা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সমিতির সংগঠক। কালো মেঘে রূপালি রেখার মতো উজ্জ্বল দিক হল প্রশাসন খড়্গপুর এবং ঝাড়গ্রাম অফিসকে দুর্নীতিমুক্ত করতে যে কর্মচারীদের বাছলেন তাঁদের মধ্যে একজনও শাসকদলের অনুগামী ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নেই।

কালা আদেশনামা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই কর্মচারী সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কালা আদেশনামার বিরুদ্ধে খাদ্য দপ্তরে ডি ডি পি এন্ড এস আধিকারিকের ঘরের সামনে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির ডাকে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সমাবেশের পর আধিকারিকের কাছে এই কালা আদেশনামা বাতিলের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সহযোদ্ধা, সহকর্মীদের উপর প্রশাসন ও আড়কাঠিদের যৌথ হামলার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের জঙ্গি মেজাজের প্রতিবাদ ছিল চোখে পড়ার মতো। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 9th Issue, January 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

১৬ জানুয়ারি ২০১৫, পাঁচ দফা দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (ডব্লু বি এম ও এ)-র বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির পক্ষে গত ১৬ জানুয়ারি ১৫, কর্মচারীদের জ্বলন্ত ৫ দফা দাবিকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান ও কলকাতার রানী রাসমনি রোডে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই সমাবেশে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে বিপুল সংখ্যায় কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদিনের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আশিস গোস্বামী, পিনাকী সেনগুপ্ত এবং রত্না সেনগুপ্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুখেন্দু কুণ্ডু। প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি এই রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি বলেন এরা এতটাই দুর্বিনীত যে কর্মচারীদের স্মারকলিপি পর্যন্ত গ্রহণ করতে চায় না। দাবি মেনে নেওয়া তো অনেক পরের কথা, দাবি প্রস্তাবই গ্রহণ করতে চায় না। অতীতে কোনোদিন রাজ্যে এই জিনিস ঘটেনি। পূর্বের বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত কর্মচারী সংগঠনের দাবি প্রস্তাব গ্রহণ করতেন এবং যত্ন সহকারে তাদের বক্তব্য শুনতেন। সংগঠনগুলির কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আজকে রাজ্যের কর্মচারীরা ভয়াবহভাবে আক্রান্ত। কর্মচারীদের দূরদূরান্তে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে কোনো কারণ ছাড়াই। কর্মচারীরা বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দ্বারা প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন। কর্মচারীদের ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাকী পড়ে রয়েছে, কবে পাওয়া যাবে তা কেউ জানে না। অথচ এই সরকার কর্মচারীদের কোনো বক্তব্যই শুনতে চায় না। এরা ব্যস্ত শুধু উৎসব, মেলা ও খেলা নিয়ে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে উৎসব ও ক্লাবগুলিকে দান খয়রাতি করতে। অথচ বকেয়া মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গ এলেই পূর্বতন সরকারের ফেলে যাওয়া ঋণের কথা বলেন। অপ্রয়োজনীয়ভাবে এবং অত্যন্ত বিসদৃশভাবে বিভিন্ন

প্রধান বক্তা মনোজ কান্তি গুহ

সরকারী ভবন ও অন্যান্য স্থাপত্যগুলিকে নীল সাদা রং করা হচ্ছে। পরিকল্পনা ছাড়াই সরকারী দপ্তরগুলিকে যত্রতত্র পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কোনো প্রকৃত সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না।

প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা দেবলা মুখার্জী। তিনি রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস

কেন্দ্রীয় সমাবেশের একাংশ

পরিচালিত রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের প্রতি তীব্র বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্য কর্মচারীদের রাস্তায় নেমে আন্দোলনের আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কর্মচারীরা গোটা দেশের অন্যান্য রাজ্যের কর্মচারীদের তুলনায় সব থেকে কম মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ৪৯ শতাংশ কম হারে মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধির ছোবল ব্যাপকভাবে গোটা সমাজের উপর পড়ছে, অথচ কর্মচারীরা এর থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। অথচ রাজ্য কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন গঠনের কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণে শূন্যপদ পড়ে রয়েছে অথচ সেখানে স্থায়ী নিয়োগ করা হচ্ছে না। স্থায়ী পদগুলিতে চুক্তির ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণে নিয়োগ চলছে। চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের বিপুল সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ সেগুলি মেটাবার কেউ নেই। চুক্তিতে নিয়োগের প্রক্রিয়া রাজ্যের বেকার তরুণ তরুণীদের প্রতি চরম প্রতারণা এই সরকারের। সাধারণ সম্পাদিকা এদিনের সমাবেশে বিপুল সংখ্যক কর্মচারীদের উপস্থিতিকে অভিনন্দন জানান এবং আগামী দিনের আন্দোলনের পক্ষে এই সমাবেশ ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

এছাড়া এদিনের সমাবেশে প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি বলেন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা। কো-অর্ডিনেশন কমিটিই পারে লড়াই, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের দাবি আদায় করতে। তাই বকেয়া মহার্ঘভাতাসহ অন্যান্য দাবিতে রাজ্য কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে আগামী দিনে আরো তীব্র আন্দোলন করতে হবে। তিনি বিগত ১০ সেপ্টেম্বর রাজ্য কর্মচারীদের স্মারকলিপি রাজ্য সরকার গ্রহণ না করতে চাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন—সেদিনও মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাননি। পরবর্তীকালে কর্মচারীদের বিক্ষোভ আঁচ করে শিক্ষামন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য। যদিও আলোচনাকালে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করছেন বলে মনে হলেও পরবর্তীকালে সমস্ত দাবিই উপেক্ষিত থেকে গেছে। আজকেও আপনাদের একই অভিজ্ঞতা। রাজ্য সরকারের মূল কার্যালয় নবান্ন ভবনে এক দমবন্ধ করা পরিবেশ। ওটা কর্মচারীদের কাজের জায়গার বদলে জেলখানা বললে সঠিক বলা হয়। ওখানে কেউ কারও সাথে মন খুলে কথা বলতে পারে না। সবসময় ভয়ভীতির মধ্যে কাটাতে হয়। তিনি বলেন, সরকার কোনো আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে চলছে না। আমাদের রাজ্যের অর্থব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। গোটা রাজ্য জুড়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা চলছে। সমস্ত অংশের মানুষ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নৈরাজ্য চলছে। নতুন কারখানা হওয়া তো দূরের কথা একের পর এক চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কাজের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। কর্ম প্রার্থীদের চুক্তিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্তদের পুনঃনিয়োগ করে সরকারের কাজকর্ম চালু রাখতে চাইছে। এই পরিস্থিতিকে ভেদ করার লক্ষ্যে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা সমস্ত কর্মচারীদের কাছে বারে বারে যাচ্ছি, সুদূর ব্লকস্তর পর্যন্ত কর্মচারীদের কাছে আমরা গিয়েছি এবং আবার যাব। এর মধ্য দিয়ে আমরা ব্যাপক ভিত্তিক কর্মচারী ঐক্য গড়ে তুলতে চাই। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিরোধী সংগঠনগুলি সম্পর্কে বলেন, বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন এরা দুবেলা মহার্ঘভাতা দেওয়া নিয়ে আকাশ বাতাস আলোড়িত করত। অথচ এখন বিপুল বকেয়া থাকা সত্ত্বেও এদের কর্মচারীরা দেখতে পাচ্ছেন না। আমরা লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সমস্ত দাবি আদায় করে আনবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মূল কর্মসূচীর আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার পরিজন চৌত্রিশ হাজার পোস্ট কার্ড নবান্নে পাঠান। □

শার্লি হেবডো-এ সন্ত্রাসের কথা

মজার ছবির মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব ছবিগুলোকে তুলে ধরার কাজ করে কার্টুন। সেই কার্টুন নির্ভর ফরাসী ব্যঙ্গ সাপ্তাহিক ''শার্লি হেবডো''-র দপ্তরে গত ৭ জানুয়ারি ২০১৪ সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের ভয়াবহ আক্রমণ সংগঠিত হয়। এই আক্রমণে পত্রিকা সম্পাদক স্তেফান শার্বনেয়ার (Stephane Charbonnier), পত্রিকার তিনজন নামজাদা কার্টুনিস্ট কাবু, টিগোনাস, ওলিনস্কি (Cabu, Tignous, Wolinsky) সহ ১২ জন নিহত হয়। প্যারিসের রাস্তায়, অন্যতম ব্যস্ত এই অঞ্চলে দিনে দুপুরে মুখোশধারী তিন আততায়ী কালাশনিকভ রাইফেল ও রকেট লঞ্চার নিয়ে শার্লি হেবডোর দপ্তরে ঢুকে কনফারেন্স রুমে পৌঁছে যায় এবং এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, কার্টুনিস্ট, কর্মী ও দেহরক্ষী সহ মোট ১২ জনকে নিমেষে হত্যা করে ছিনতাই করা গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে আলকায়দা জঙ্গী বলে অভিহিত করেছে।

এই আক্রমণের প্রায় সাথে সাথেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ফরাসী রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া ওলান্দে। তিনি এই আক্রমণকে বর্বরতা ও স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে অবিহিত করে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ফ্রান্স কড়া পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছেন। তা সত্ত্বেও প্যারিস শহরে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে। দুই আততায়ী সহ আরও চারজনের মৃত্যু ঘটেছে এবং আবারও একটি পত্রিকা অফিস আক্রান্ত হয়েছে। এই ধারাবাহিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্যারিসের নাগরিক ও পর্যটক সকলেই সন্ত্রস্ত রয়েছে।

১৯৬৯ সালে শার্লি হেবডো (Charlie Hebdo) পত্রিকার জন্মলগ্নে এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন ফ্রান্সিস কাভান্না (Francois Cavanna)। তিনি এই পত্রিকাটি ১৯৮১ সাল অবধি চালানোর পর অর্থাভাবে তা বন্ধ করে দিতে হয়। ফিলিপ্পি ভ্যালুনটি (Philippe Valuntil) ১৯৯২ সালে আবার এই পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে থাকেন। সবরকম ধর্মীয় অন্ধ আবেগের বিরুদ্ধে কষাঘাত করাই ছিল এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। তির্যক প্রতিবেদনের পাশাপাশি আক্রমণাত্মক কার্টুনই মূল হাতিয়ার। এই পত্রিকা শুধু ইসলাম নয়, ভাটিকানের পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজিকেও ব্যঙ্গে চিত্রায়িত করতে ছাড়েনি। শিল্পপতি, মন্ত্রী কাউকেই রেয়াত করেনি এবং মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাতেও সরব ছিল এই পত্রিকাটি। এই ব্যঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুন যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, তেমনই তা নানারকম ক্ষোভ বিক্ষোভ ও বিতর্কও তৈরি করেছে।

ঘটনার সূত্রপাত ২০০৬ সালে। ডেনমার্কের এক সংবাদপত্রে ইসলাম ধর্মগুরুকে নিয়ে প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্র শার্লি হেবডো তাদের পত্রিকায় ছাপায়। এই কার্টুনটি ডেনমার্কের পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরেই তোলপাড় চলছিল। শার্লি হেবডো তো পুনরায় ছাপাতে এই বিষয়ে ঘৃতাহুতি হয়। সেই ব্যঙ্গ চিত্রটি এঁকেছিলেন কার্টুনিস্ট কুর্ট ওয়েস্টারগার্ড (Kurt Westergaard)। তখনকার মত বিষয়টি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও পরবর্তী সময়ে শার্লি-র প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন স্তেফান শার্বনেয়ার। তিনি ২০১১ সালে ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপলেন এই পত্রিকায়। প্রত্যুত্তরে বোমা মেরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল পত্রিকা অফিসে। সেটা ২ নভেম্বর ২০১১—ভস্মীভূত হল পত্রিকা দপ্তর। কিন্তু এরপরও প্রকাশনা বন্ধ থাকেনি 'শার্লি হেবডো' পত্রিকার। পত্রিকা সম্পাদকের জীবন সংশয় ছিল তাই তার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং ফ্রান্সের সরকার এই পত্রিকাকে একটু সংযত হয়ে প্রকাশনার কাজ চালাতে বলেছিলেন। সম্পাদক শার্বনেয়ার বলতেন ''হাঁটু মুড়ে বাঁচার থেকে সোজা দাঁড়িয়ে মরা ভালো।'' এরপর আরো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকাটি। যার মাসুল গুনতে হল ১২টি প্রাণ দিয়ে।

ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশনার ক্ষেত্রে ফ্রান্সের জুড়ি মেলা ভার। ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা সেখানে যেমন বেশি, সেইরকম ব্যঙ্গ রসবোধ ফ্রেঞ্চ মানসিকতার একটা বিশেষ দিক। তবে সংবাদ প্রকাশনা, বাক স্বাধীনতা বা ব্যঙ্গাত্মক ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ নতুন নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম বহু ঘটনার উদাহরণ আছে। বিশ্ববন্দিত চিত্র পরিচালক চার্লি চ্যাপলিনকেও আক্রান্ত হতে হয়েছে। খ্যাতনামা চিত্রকর মকবুল ফিদা হুসেনকেও হতে হয়েছে আক্রমণের শিকার। অতি সম্প্রতি আমাদের রাজ্যের সরকার ও বাক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পথে হাঁটছেন—সমালোচনা সহ্য করতে পারছেন না। সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ব্যঙ্গ শেয়ার করতে গিয়ে আমাদের রাজ্যের এক অধ্যাপককে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। সম্প্রতি আমির খান পরিচালিত ছবি (PK) পিকে-কে মৌলবাদী শক্তির রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। আসলে ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর, বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ নামিয়ে এনে গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে সচেতন ভাবেই। □

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার রাজ্য সম্মেলন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠন কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার ৪৮তম রাজ্য সম্মেলন গত ১০-১১ জানুয়ারি ২০১৫, ভবতোষ রায় নগর, মধুসূদন বাগচি মঞ্চ, অর্থাৎ কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হল। ১০ জানুয়ারি সকাল ১০.৩০ মিনিটে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন সমিতির সভাপতি কমরেড নির্মল পাল।

এই সম্মেলন উদ্বোধনের প্রাক্কালে ৯ জানুয়ারি ২০১৫ বিকালে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়ালের ছোট হলে কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় বুক স্টল এবং সংগঠনের মুখপত্র ''আন্দোলনের অরুণিম''-এর সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। স্থায়ী সভাপতি নির্মল পাল সহ পশুপতি ভৌমিক, প্রদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল বসু এবং গোবিন্দ দাস সহ পাঁচজনকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সংগ্রামী হাতিয়ার-এর সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। তিনি বলেন—রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিভুক্ত সংগঠনগুলির মধ্যে কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থা একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন। তিনি আন্তর্জাতিক জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বলেন অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে যেমন প্রতিকূলতার উপাদান থাকে ঠিক সেইরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু অনুকূল উপাদান থাকে—যাকে পাথেয় করে আন্দোলন সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্বৈরচারী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রয়োজনে সর্বাত্মক ধর্মঘটে কর্মচারী সমাজকে সামিল হয়েই অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করতে হবে।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন যথাক্রমে সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক জনার্দন সামন্ত এবং কোষাধ্যক্ষ অমিতাভ সাহা। ১০টি প্রস্তাব এই মঞ্চ থেকে গ্রহণ করা হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১৯টি জেলা দীর্ঘ আলোচনায় অংশ নেয়। আলোচনাকালে অনেকগুলি জেলা আগামী দিনে আন্দোলনের শেষ অস্ত্র ধর্মঘটে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন এবং বলেন ভয়ভীতি উপেক্ষা করে সর্বাত্মক ধর্মঘটের প্রেক্ষাপট গড়ে তুলতে হবে। এই সম্মেলনে ৩৯৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থেকেছেন, এর মধ্যে ৮ জন মহিলা। দু'দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে ৩৪ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল রায়। পদাধিকার সহ সম্মেলন মঞ্চ থেকে ৫৬ জনের নতুন কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন—**সভাপতি ঃ** পশুপতি ভৌমিক, **সাধারণ সম্পাদক ঃ** সুনির্মল রায়, **যুগ্ম সম্পাদক ঃ** জনার্দন সামন্ত ও রজত সাহা এবং **কোষাধ্যক্ষ ঃ** অমিতাভ সাহা।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই সফল সম্মেলনে পরিসমাপ্তি ঘটে। □

সুগত দাস

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।